স্বর্ণভূমি

কিঙ্কর আহ্‌সান

গল্পগ্রন্থ স্বর্ণভূমি-তে কিঙ্কর আহ্সান আরো পরিণত, শাণিত। চৌদ্দটি গল্পে স্বর্ণভূমির জায়গাজমি নির্মিত। সমতল থেকে পাহাড় লালমাই অবধি বিস্তৃত তার গল্পের ভূখন্ড। অচরিতার্থ প্রেমের এক অনন্য গল্প বয়ন হয়েছে 'অসুখের গান'-এ ; এই তো গল্প যা পড়ে পাঠক বোধ করে জীবন ঠিক এমন নয় তবে এমন হতেও পারে। এই বোধের বলে কিঙ্করের প্রায় সব গল্পই আমাদের সম্মোহন জাগায়। কোলাহলের কারাগার-বাস্তবে আর সোনার হরিণের স্বপ্নে স্বর্ণভূমি আরো স্বর্ণাভ হয় যেন। নিসর্গসবুজ উদ্ভাসনে গল্পের মাঠ-ঘাট-দিগন্ত আরো নিবিড় একান্ত হয়ে উঠে। 'পত্রকথন'-এর অবয়বে বকুল ফুল অজানিতে যেন আমাদের কাছেও মন খারাপ করা রঙবাহার নিয়ে উপস্থিত হয়। আর 'কচুরিপানা জীবন' এর মতো গল্প যে গল্পকার লিখতে পারেন সে নিশ্চয়ই অনেক দূর যাবে। একটা এলেবেলে মানুষ তোজাম্মেল ভালোবাসার সোনার রেখায় যেভাবে দশের ভিড়ে একাদশ হয়ে ওঠে তাকে কিঙ্কর অনন্য শিল্পদক্ষতায় চরিত্র হিসেবে নির্মাণ করে তোলেন। তোজাম্মেলের মতো আমরাও তখন বলে ওঠি- কচুরিপানা জীবনের চেয়ে মরে যাওয়া ভাল। নামগল্প 'স্বর্ণভূমি'তে কিঙ্কর তার স্বর্ণস্বাক্ষর রাখলেন যেন। এক দিনের নিষ্পাপ শিশুর মৃত্যুর সঙ্গে সমকালীন কেঁচোবাস্তবে বেঁচে থেকে প্রতিদিন একটু একটু করে মরে যাওয়া লেখককে প্রতিতুল্য করে সময়ের সামগ্রিক মৃত্যুলক্ষণকেই ইঙ্গিত করেন গল্পকার যেখানে একদিন বয়সী শিশুর মৃত্যু নিরুপায় লেখককে নতুন একটা গল্পের প্লট দেয় মাত্র। এভাবেই কিঙ্কর আহ্সান তার নিজস্ব কথকতা ও ভাষার রক্তে-সংবেদের বলে অনায়াসে আমাদের কণ্ঠ থেকে ধ্বনি তোলেন– বাংলা ছোটগল্প মরে যায়নি, এই তো কিঙ্কর আহ্সান নামের একজন সুগাল্পিকের সন্ধান পাচ্ছি।

-পিয়াস মজিদ

উৎসর্গ

অনন্যা ব্যানার্জি

ছোট ভাইটিকে ভালোবেসো দি। ভালো থেকো।

কিঙ্কর আহ্সান / স্বর্ণভূমি

প্রথম প্রকাশ: অমর একুশে গ্রন্থমেলা ২০১৫
প্রকাশক: ফয়সল আরেফিন দীপন
জাগৃতি প্রকাশনী
৩৩ আজিজ সুপার মার্কেট
নিচতলা, শাহবাগ, ঢাকা ১০০০
আলাপন: ৮৬২৩২৩০

প্রচ্ছদ: মেহেদি হাসান
মুদ্রন: দি ঢাকা প্রিন্টার্স
পান্থপথ, গ্রীনরোড, ঢাকা
মূল্য: ১৬০ টাকা

Online distributor: www. Rokmari.com
https://www.facebook.com/kingkorahsan2

লালমাইয়ের লাল মাটি
অসুখের গান
কল্পদৃশ্য
কড়ি খেলিবার ঘর
পত্রকথন
কচুরীপানায় জীবন
শতদলী মকবরা
কাঠবাক্সে মা
প্রবঞ্চন
স্বর্ণভূমি

লালমাইয়ের লাল মাটি

তীরটা মাথার অনেক ওপর দিয়ে চলে গেল।

সন্ধ্যে হতে দেরি নেই আর। আকাশ কালো হয়ে এসেছে। আঁধার নামবে নামবে ভাব। শীত পড়েছে। এই জঙ্গলের ভেতর শীতটা একটু বেশিই।

দানবের মতন বড় একটা গাছের পাশে বসে লালমাই। তীরটা হাতেই থাকে। শরীরে তার পাঁতলা একটা কাপড়। পরনে ধুতি। শীতে কাঁপুনি ধরে। সারাদিন তেমন কিছু খাওয়া হয়নি। ক্লান্ত লালমাইয়ের শীতটা তাই একটু বেশিই লাগে।

ধুতির খোটে রাখা সামান্য কাঁচা চাল বের করে চিবোতে থাকে সে। দাঁতের অবস্থা ভালো না। এই শক্ত চাল চিবোতে কষ্ট হয়। নড়বড়ে দাঁত বেসামাল হয়ে ওঠে। একটু একটু ব্যথা হয়। ডানদিকের একদম কোনার দাঁতটা পড়ো পড়ো অবস্থা। প্রায়ই ব্যথা হয় আর রক্ত পড়ে।

তেলেনজোতা পাতা আর লবণ মিশিয়ে গরম পানিতে কয়েকদিন গার্গল করার পর ব্যথা কমেছিল। গায়ের চিকিৎসক ডিমের কুসুমের সাথে প্রতিদিন রাতে শামুকের মাংসের রস মিশিয়ে খেতে বলেছিল। লালমাই সে কথা মানতে পারেনি। গরিব মানুষ প্রতিদিন ডিম খাবে এটা কিভাবে সম্ভব?

লালমাই মাটি খোঁড়ার কাজ করত। গ্রামে আগে কুয়ো খোঁড়ার চলছিল। তাদের গ্রামের সাতটি পরিবার এই কুয়ো খোঁড়ার পেশায় ছিল। বাড়ির সব পুরুষরা কাজ পেলেই বের হয়ে পড়ত। আয় নেহাত মন্দ ছিল না। পরিবার নিয়ে ভালো মতনই চলা যেত।

লালমাইয়ের তখন বয়স ছিলো কম। চোখে ছিলো স্বপ্ন। পরিশ্রমও করতে পারতো অনেক। আয় যা হতো মদ খেয়ে দু-হাতে ওড়াত তা। ভেবেছিল কোন এক সময় টাকা জমাবে। টাকা জমানোর জন্য ঢের সময় আছে হাতে। কিন্তু ভুল। কুয়োর জায়গা নিয়ে নিল টিউবওয়েল।

নতুন নতুন সব লোক আসল টিউবওয়েল বসানোর পেশায়। কেউ আর কুয়ো কাটার ঝামেলায় গেল না। লালমাইয়ের মতন আদিবাসীরা তাই পড়লো কঠিন বিপদে। কাজ হারিয়ে উপোস কাটাতে লাগল পরিবারের মানুষ। পরিবারের নারীরা কাপড় আর খাওয়ার অভাবে চলে গেল বাজারে।

এলাকায় আদিবাসী এই নারীদের ভালো চাহিদা। পুরুষদের সাথে ছলাকলায় ওস্তাদ তারা। পুরুষরা ঘরের দায়িত্ব নিল। বাচ্চা-কাচ্চা দেখা, ঘর পরিষ্কার রাখা, রান্না-বান্না সব সামলায় পুরুষরাই। বউ বাজারে আছে এ নিয়ে তাদের তেমন কোনো আক্ষেপ নেই। বউয়ের শরীর পবিত্র না অপবিত্র এ নিয়ে ভাবে না তারা।

তবে ঝামেলা অন্য জায়গায়। ঘরে থাকতে থাকতে একসময় পুরুষরা হাঁপিয়ে ওঠে। সারাক্ষণ ঘরে থাকা তাদের পোষায় না। ঘরে তৈরি মদ খেয়ে তাই সবাই দুঃখ করতে বসে। কাঁদে। বউদের সাথে শোয়ার সুযোগ হয় না। বাড়ি ফিরে বউরা থাকে ক্লান্ত।

কেউ কেউ ভাবে ভারতে চলে যাবে। সেখানে তাদের জাতের আরও অনেকে আছে। এই দেশে মাত্র সাতটি পরিবার নিয়ে এভাবে টিকে থাকা মুশকিল। কেউ বললো চলে যাবে মুক্তাগাছায়। সেখানে গিয়ে রিকশা চালাবে। মাল বইবে। তবে যাওয়া আর হয় না। এতদিনের পুরনো ভিটে ছেড়ে যাওয়াই সম্ভব না। তাদের সর্দার বালাবাবু তো বলেই বসে, 'কিরাম যাবু। এদ্দিনা পুরান মাটি। যাওন সহজ নয়। সহজ নয় কিতা।' সবাই তাই কাজ খুঁজতে থাকে।

কাজ মিলেও যায়। কেউ স'মিলে কাজ শুরু করে। কেউ আবার এটা ওটা বেচে ছোট্ট দোকান দিয়ে বসে বাজারে। লালমাইয়ের এসব পছন্দ না। তার একটা ইজ্জত আছে। তাদের জাতের কেউ এসব কাজে জড়ানো মানে জাতকে অপমান করা। জন্মই যাদের শিকার করা আর কুয়ো খোঁড়ার জন্য তারা কেন এসব কাজে জড়াবে শুনি! তাই সে অন্য কাজ করে না। শিকার করে যা মেলে তা খেয়ে দিন চালায়।

সে বিশ্বাস করে একদিন টিউবওয়েল নামক দানবটা ধ্বংস হবে। তখন সে আবার কাজে যোগ দেবে। আবার ফিরে আসবে সুখের দিন!

সন্ধ্যেটা কেমন যেন। আসতে না আসতেই ফুরিয়ে যাওয়ার জন্য পাগল হয়ে যায়! আকাশ শরীর কালো রঙ এ ছেয়ে যেতে সময় লাগে না। সূর্যের শেষ আলোটুকুও টুপ করে নিভে যায় একসময়। লালমাই বাড়ির পথ ধরে। শিকারে কিছুই পাওয়া গেল না। কিছু একটা দরকার ছিল। কিছু একটা। সে একা উপোস থাকলে অসুবিধে নেই। লালমাই না খেয়ে থাকতে পারে। টানা তিন-চার দিন দানা-পানি ছাড়া সে অনায়াসে কাটিয়ে দিতে পারে। কিন্তু যামিনীর জন্য চিন্তা হচ্ছে খুব। না খেয়ে থাকতে হবে মেয়েটাকে আরও একটা দিন।

দুর্বল শরীর নিয়ে কাঁপতে কাঁপতে বাড়ি যায় লালমাই। ঘরে কেরোসিন নেই। কুপি জ্বলবে না। এদিকে সব ঘরে বিজলী বাতি চলে এলেও আদিবাসীদের সাতটি পরিবার এসব থেকে বঞ্চিত।

আকাশে ছোট্ট একটা চাঁদ উঠেছে। লালমাইয়েরটা ছাড়া আর অন্য সব ঘরে কুপি জ্বালানো হয়েছে। লালমাই নিজের ঘরে অন্ধকারের ভেতর বসে বাইরের এই আলো দেখতে থাকে। তার ঘরে ঢোকার শব্দ শুনে যামিনী নড়েচড়ে বসে। তার কথা বলায় নিষেধ আছে। নিষেধ আছে কাঁথার ভেতর থেকে বের হতে। যামিনী তাই টু শব্দটিও না করে চুপচাপ বসে থাকে।

একটা অন্ধকার ঘরে সারাদিন বসে থাকতে ভালো লাগে না। এখানকার ঘরগুলোতে কোনো জানালা নেই। অপদেবতার কুদৃষ্টি থেকে বাঁচার জন্যই জানালা রাখা হয় না ঘরে। এখানকার মেয়েরা সূর্যের আলো ভয় করে। ঘর আবছা অন্ধকার আর স্যাঁতসেঁতে রাখতেই পছন্দ করে তারা। লালমাই এসে 'আছুইন যামিনী। আছুইন।' বলার পর যামিনী কাঁথা থেকে বের হয়। ক্লান্ত, বিষণ্ন লালমাইয়ের কাছে গিয়ে বসে। তার ঠোঁটে চুমু খায়। বোটকা একটা গন্ধ নাকে এসে লাগে। লালমাই নোংরা খুব। সপ্তাহে একদিন শরীর ভেজায় জলে। দাঁত পরিষ্কার করার ঝামেলাতে যায়ই না। প্রথম যেদিন লালমাইকে চুমু খেয়েছিল যামিনী সেদিন বমি করার মতন অবস্থা হয়েছিল। লালমাইয়ের দাঁতের মাঝে ফাঁক আছে। সেখানে খাবার আটকে থাকে। খাবার পচে, সাদা হয়ে দাঁতের ফাঁকে ঝুলে থাকে। যামিনীর এমন নোংরা থাকাটা পছন্দ নয়। ঘেন্না লাগে তার এসব। কিন্তু যামিনী লালমাইকে ভালোবাসে। ভালোবাসায় এসব ঘেন্না অতি তুচ্ছ বিষয়।

'আছিনি হাড়িয়া?' যামিনীকে নিয়ে বিছানায় শুয়ে গায়ের ওপর কাঁথা টেনে দিতে দিতে বলে লালমাই। যামিনী কাঁথা থেকে বের হোক এটা চায় না সে। কাঁথা থেকে বের হলেই যত ভয়।

ভেতরটা গাঢ় অন্ধকার। যামিনী, লালমাই কেউ কাউকে দেখতে পায় না। শুধু নিঃশ্বাস টের পাওয়া যায়।
'হারিয়া ভালা না।' আস্তে করে বলে যামিনী। তার শরীরটা খারাপ। বড় অভাবে কাটছে এখন দিন। যামিনী ক্ষিধে সহ্য করতে পারে না। বাবার ঘরে থাকতে কখনো তাকে উপোস করতে হয়নি। লালমাইয়ের সাথে পালিয়ে এসেছে তিন মাস হলো। এই তিন মাসে কখনও খাবার নিয়ে অভিযোগ করেনি লালমাইয়ের কাছে। কাঁথার ভেতর লুকিয়ে ছিল। রাত হলে লালমাইকে ভালোবেসেছে। কাঁথার ভেতর থেকে কথা বলেছে সারা রাত।
পয়সা আসলে যামিনীকে নিয়ে ভারত চলে যেতে চায় লালমাই। সেখানেই বিয়ে করে পাতা হবে সত্যিকারের সংসার। কিন্তু পেটপুজোর কাজই ঠিকমতন হয় না পয়সা জমানোতো অনেক দূরের ব্যাপার!
যামিনীর আজকাল ক্ষিধে পায় খুব। এর কারণও আছে। কারণটা এখনই লালমাইকে জানানো যাবে না। আরো কিছুদিন যাক, অভাব দূর হোক তারপর সব বলা হবে। সব বলা হবে।
কয়েকটা দিন হাড়িয়া আর কাঁচা চাল খেয়েই কাটছে। হাড়িয়া নামের পানীয়টা যামিনীর পছন্দ না। সে আদিবাসী না। আদিবাসীদের এসব খাবার কখনও খাওয়া হয়নি আগে। কষ্ট হলেও ভালোবাসার জন্য যামিনী এসব খায়। খেতে হয়। শরীরের খেয়ালটা এখন রাখা দরকার।
'মাপ করিও।' বলে লালমাই। এতক্ষণ চুপ করে ছিল সে। যামিনীর বুকে মাথাটা রেখে কথাটা বলে।
'ক্যানে? ঠিক হয়া যাবিতো সব।'
'ন ঠিক হবো।'
'ঠিক হবো। ঠিক হবো।' অস্থির, হতাশ লালমাইকে শান্ত করবার জন্য তার চুলে হাত বুলিয়ে দিতে থাকে যামিনী। তারপর কাঁথার বাইরে যাতে শব্দ না যায় এমন, এতটাই আস্তে সে গান ধরে একটা- 'আইপান, যাইপান চিন্তা করি ন,

বালুবাসায় ভুলি যাবো,
দুককো থাকপ্যা ন।'

গান শুনতে শুনতে ঘুম চলে আসে লালমাইয়ের। ঘুম ঘুম চোখে স্বপ্নরা এসে ভিড় করে। তাদের রীতিতে ৪টি শাড়ি, ২ সের খাবার তেল, ২ পুরিয়া সিঁন্দুর আর ২০ টাকা পণ দিয়ে কন্যাকে ঘরে আনার নিয়ম। বিয়েতে বাড়ির উঠোনের মাঝখানে ৪টি কলাগাছ, ৪টি তীর, মাটির ঘটি রেখে তার চারপাশে সুতো দিয়ে ঘিরে দেওয়া হয়। বিয়ের ঠিক আগে আগেই নাউয়া (নাপিত) এসে কনের হাতের কানি আঙ্গুল কেটে সামান্য রক্ত নেয়। তারপর রক্তের সঙ্গে আতপ চাল একত্র করে মহুয়া পাতা দিয়ে কন্যার হাতে বেঁধে দেয়। লালমাই যামিনীকে বিয়ের আসরে দেখতে পায়। দেখতে পায় যামিনীর কানি আঙ্গুলের রক্ত। চুমুক দিয়ে যামিনীর রক্তটুকু নিয়ে নেওয়া পর্যন্ত দেখতে পায় লালমাই। এরপরই ভেঙে যায় ঘুম। প্রতিদিন, প্রতিবারই এমন এক জায়গায়। তাকে কেউ আর প্রদীপ, ধান, ঘাস দিয়ে বরণ করে নেয় না। কনের হাতে রূপোর আংটি পরিয়ে দেওয়ার পর কেউ তার মুখে গুঁজে দেয় না বিয়ের আশীর্বাদের গুড়। লালমাইয়ের এমন ভাঙা ভাঙা স্বপ্ন দেখতে খুব কষ্ট হয়। তার ঘুম ভেঙে যায়। অল্পক্ষণের জন্য। পাশ ফিরেই আবার ঘুমিয়ে পড়ে সে। একটু আগের ভাঙা স্বপ্নটাই আবার দেখতে শুরু করে নতুন করে।
লালমাই যখন ঘুমে অচেতন তখন কাথার ভেতর থেকে বের হয়ে ঘরের ভেতর একটু হাঁটাচলা করে যামিনী। সারাদিন বিছানায় পড়ে থাকলে হাত-পা কেমন জানি অবশ হয়ে আসে। যামিনীর খুব আলো দেখতে ইচ্ছে করে। ঘরের ভেতর আলো নেই বললেই চলে। যামিনীর অন্ধকার ভালো লাগে না। লালমাইয়ের সাথে প্রথম যেদিন কথা হয়েছিল সেদিন সে বলেছিল, 'আ আন্ধারের মানু।' কথা শুনে মুখ ঝামটা দিয়ে যামিনী বলেছিল, 'আন্ধার সহ্য হঅই না।' বাড়ির উঠোনে কুয়ো খুঁড়তে এসেছিল লালমাই আর তার দল। এত মানুষের ভিড়ে লালমাইকে বড়

চোখে পড়ে গিয়েছিল যামিনীর। কী তার শরীর, সে'কি তেজ! লালমাইকে দেখলেই কি যেন হয়ে যেত কুমারী শরীরটার ভেতর। যামিনী বুঝে গিয়েছিল প্রেম হবেই। আটকানো যাবে না। এসব দুনিয়ার নিয়ম। লালমাইয়ের সাথে এসেছিল তাদের সর্দার, গোত্রপ্রধান বালাবাবু। লোকটার বয়স অনেক। বউও অনেকগুলো।

বালাবাবু লোকটার চরিত্রে সমস্যা আছে। কেমন লোলুপ দৃষ্টি নিয়ে তাকিয়ে থাকত যামিনীর দিকে। যামিনীর শরীরের বাঁধুনি মন্দ নয়। পুরুষ মানুষরা তাকাবে এটাই স্বাভাবিক। কিন্তু বালাবাবুর দৃষ্টিটা আসলেই অন্যরকম। ওতে ভয় হয়। কুয়ো খোঁড়ার কাজে গিয়ে দু-একটা দেশি বাঙাল মেয়ের সাথে শোওয়া তার অভ্যাস। যামিনীর ক্ষেত্রে হিসেবটা ভুল হয়ে গেল। লালমাই কড়া প্রেমে পড়ে গেল যামিনীর। এই শক্তিশালী তরুণকে ঘাটানোর মতন সাহস নেই বালাবাবুর। তাছাড়া গোত্রপ্রধান হিসেবে তাকে কিছু বিধিনিষেধ মেনে চলতে হয়। যতই ইচ্ছে মেয়ের সাথে শোওয়া যায় কিন্তু একই গোত্রের অন্য কারো প্রেমিক, বউয়ের দিকে নজর দেওয়ায় ঘোর নিষেধ আছে। কেলেঙ্কারি হলে গোত্রপ্রধানের পদও ছেড়ে দিতে হতে পারে। গোত্রপ্রধান তাই চুপ যান। যামিনী লালমাইয়ের ঘরে লুকিয়ে আছে এটা তার জানা। লালমাইকে বলেছিল সময়-সুযোগমতন তাদের বিয়ের ব্যবস্থা করে দেবে। যামিনী এই লোকের কথা তখন বিশ্বাস করতে চায়নি। কিন্তু বিশ্বাস না করেও উপায় ছিল না। তাছাড়া লালমাইয়ের শক্তি ছিল বলে ভয়টাও ছিল কম। এখন লালমাই ফুরিয়ে গিয়েছে। গোত্রপ্রধানের যন্ত্রণাও শুরু হয়েছে তাই। লালমাই বাড়িতে না থাকলে আশপাশের লোকজনদের চোখ বাঁচিয়ে চলে আসে বালাবাবু। যামিনীর পাশে এসে বসে। মিষ্টি মিষ্টি কথা বলে। শরীরে হাত দেয়। লোভ দেখায় তার ঘরে চলে আসার জন্য। সে বউ করে নেবে যামিনীকে। গোত্রপ্রধানের সাত খুন মাফ। যামিনী বউ হলে কেউ তাকে কিছু বলার সাহস পাবে না। আরও বলে লালমাইয়ের দিন শেষ। যামিনীকে রাখার সাধ্য তার নেই। অতশত না ভেবে যামিনীকে দ্রুত সিদ্ধান্ত নিতে বলা হয়। নইলে সবাইকে যামিনীর কথা জানিয়ে দেবার হুমকি দেওয়া হয়। লোকজন যদি জানে বাঙ্গাল মেয়েকে ঘরে এনে লুকিয়ে রেখেছে লালমাই তবে বহুত হাঙ্গামা হবে। পুলিশ আসবে। লোকজন পিটিয়ে মেরে ফেলবে লালমাইকে।

বালাবাবুর মুখে এসব কথা শুনে কান্না পায় যামিনীর। অনেক কষ্টে কান্না থামিয়ে চুপ করে থাকে সে। চুপচাপ থেকে তার শরীরে বালাবাবুর ময়লা, বয়স্ক, অমসৃণ হাতের স্পর্শ সহ্য করে যামিনী। লালমাইকে কখনো বলে না এসব কথা। এত কষ্টের ভেতর লালমাই এসব নিয়ে আবার দুশ্চিন্তা করুক চায় না সে।

হাঁটতে হাঁটতেই রাত ভোর করে ফেলে যামিনী। কাছাকাছি মোরগ ডেকে ওঠে। যামিনী লালমাইকে ওঠানোর চেষ্টা করে। সকাল সকাল জঙ্গলের দিকে শিকার হয়তো ভালো মিলবে এই আশায়। তাছাড়া নিজের গোপন কথাটা, ক্ষিধে বেশি লাগার কথাটা এই সাতসকালে জানিয়ে দিতে ইচ্ছে করছে খুব। আরো কয়েকদিন পরে জানালেও হতো। কিন্তু হঠাৎ করেই কেন জানি তর সইছে না একদমই।

লালমাইয়ের কপালে একটা চুমু খায় যামিনী। ঘুম ভাঙানোর জন্য পাশ ফেরাতেই খাট থেকে পড়ে যায় লালমাইয়ের নিথর শরীরটা। যামিনী অবাক হয় না। নাকের কাছে হাত দিয়ে নিঃশ্বাস টের না পাওয়ায় সে নিশ্চিত হয় লালমাই আর নেই। পৃথিবী ছেড়েছে তার ভালোবাসার মানুষটি। এমনটাই হবে, এমনটাই হতো একদিন এটা আঁচ করতে পেরেছিল যামিনী। কিন্তু তাই বলে এত তাড়াতাড়ি সেটা বোঝেনি সে।

লালমাই বলেছিল, মরে গেলে কোনো বাঁশ ছাড়াই যেন মৃতদেহ মাটিচাপা দেওয়া হয় তার। মাথা উত্তরে আর পা দক্ষিণে রেখে কবরে যেন দেওয়া হয় এক হাঁড়ি কাঁচা চাল। পরকাল সুন্দর হোক। অনাহারে না কাটুক দিন। লোকজনের দোয়ার জন্য পঞ্চাশ জন অনাহারীর মুখে একবেলার খাবার যেন দেওয়া হয়। দিন শেষ হয়ে আসছে বুঝেই হয়তো এসব কথা বলে গিয়েছিল লালমাই।

যামিনী শক্ত ধাঁচের মেয়ে। নিজেকে সামলে নিতে জানে। তাইতো এই অঘটনের পরও শোকে কাতর হয় না।

নিজেকে সামলে নিলেও শরীরে আসা লালমাইয়ের অস্তিত্বের কথাটুকু জানানো গেল না দেখে একটু একটু খারাপ লাগতে থাকে তার। লালমাইয়ের শেষ ইচ্ছেগুলো পূরণ করতে হবে। সিদ্ধান্তটা নিয়েই ফেলে যামিনী। বাবার বাড়ি ফিরবে না ঠিক করে বের হয় ঘর থেকে।

অনেকদিন পর শরীরে আলো লাগায় কেমন চিড়বিড় করে শরীরটা। আকাশে সূর্য উঠবে বলে জানান দিচ্ছে। বাতাসে একটা নীলচে আলোর রেখা ভেসে বেড়াচ্ছে। এখনও বিছানা ছাড়েনি কেউ। গোত্রপ্রধানের বাড়ির দরজার সামনে গিয়ে দাঁড়ায় যামিনী। ঢুকবে কি ঢুকবে না এই নিয়ে দ্বিধাদ্বন্দ্বে ভোগে কিছুক্ষণ। লালমাইয়ের মুখটা মাথার ভেতর। ছুটে গিয়ে তার ঠোঁটে থ্যাবড়া একটা চুমু দিতে ইচ্ছে করে। তারপর বলতে ইচ্ছে করে দারুণ আনন্দের গোপন কথাটা। মরে গেলে কেন যে আর মানুষ শুনতে পায় না এ নিয়ে আফসোস হয় যামিনীর খুব।

ঠিকঠাকভাবে লালমাইয়ের সৎকারের জন্য বালাবাবুর কাছে নিজেকে সঁপে দিতে হবে। শরীরের ভেতরের শরীরটাকে বাঁচানোর জন্য বালাবাবুর আশ্রয় লাগবে। যামিনী এটা করবে। বেঁচে থাকার জন্য কত কিছুই না করতে হয়! এটুকু করলে দোষ নেই।

শরীরের ভেতরের মানুষটার জন্য বড্ড ক্ষিধে পায়। প্রচণ্ড কষ্টে এইবার যামিনীর চোখ থেকে দু'ফোঁটা জল গড়িয়ে পড়ে। ক্ষিধে নিয়ে খুব আস্তে করে কাঁদতে কাঁদতে সে বলে, 'লালমাই লালমাই দুককো থাকপ্যা ন।' সে কথা নিজের কাছেই কেমন মিথ্যে মিথ্যে শোনায়। যামিনী বালাবাবুর দরজায় কড়া নাড়ে। বালাবাবু দরজা খোলে। যামিনীকে দেখে অবাক হয়। অবাকপনা কাটে ক্ষণিকেই। ঘরে বউগুলো তার মরার মতন ঘুমোচ্ছে। সব ঘরের সবাই ঘুমোচ্ছে। সূর্য উঠতে মিনিট দশেক কি বিশেক দেরি হবে। বালাবাবু মনে মনে বলে, 'ভগবান, ন উঠি সূর্য। ন উঠি সূর্য।' ভগবান তার মনে মনে বলা কথা শোনেন মনে হয়। সূর্য উঠতে দেরি হয়। সবাই ঘুমিয়ে থাকে। যামিনী টের পায় শরীরজুড়ে ময়লা, বয়স্ক, অমসৃণ একটা নোংরা হাতের স্পর্শ। বমি পায়। ঘেন্নায়, দুঃখে যামিনীর বমি পায়। নীলচে অন্ধকার, নিস্তব্ধতার ভেতরে আচমকা একটা মোরগ কঁক, কঁক করে ডেকে ওঠে। সূর্যের ঘুম ভাঙানোর জন্য তার সে'কি ব্যাকুল আবেদন। মোরগটার প্রতি কৃতজ্ঞতায় যামিনীর চোখ হতে গড়িয়ে পড়তে থাকে জল। মেয়েদের চোখের জল ছাড়া আর আছেই বা কি? মোরগটা ডেকেই যায় কঁক কঁক কঁক। ভগবান শোনে না। কোনো দিন শুনবেও না। সে দল পালটিয়েছে যে!

অসুখের গান

১.

ট্রেনের বগিতে লাশ পড়েছিল সোলায়মান সাহেবের।

তার মেয়ের বিয়ে। ঢাকা থেকে রাজ্যির জিনিসপত্র কিনে বাড়ি ফিরছিলেন। গতকাল দুপুরের কথা। ভ্যাপসা গরম পড়েছিল। কমলাপুর রেলস্টেশনে ভিড় ছিল কম। ট্রেনের টিকিট কাটা ছিল আগেই। স্টেশনে বাইরে থেকে এক গ্লাস পেপের শরবত খেয়ে উঠে পড়েছিলেন ট্রেনে। ট্রেনও ছেড়েছিল সময়মতন। জানালার পাশে সিট। হাওয়া মাখানো রোদ এসে ধাক্কা মারছিল গায়ে, টুলে আর চোখের পাতায়। রোদের ওম নিতে নিতে বড় মন ভালো ভাব নিয়ে বাড়ির পথে যাত্রা করেছিলেন পঞ্চাশ বছর বয়সী সোলায়মান।

একমাত্র মেয়ের বিয়ে। মন ভালো থাকারই কথা। মন ভালো থাকা সোলায়মান সাহেব তাই ট্রেনের কোনো ফেরিওয়ালাকেই ফিরিয়ে দিচ্ছিল না। সিদ্ধ ডিম থেকে শুরু করে চকলেট সবই খেয়েছে সে। ভিক্ষুককে দিয়েছে আস্ত দশ টাকার নোট।

সবসময় হিসেব নিকেশ করলে চলে না। এখন তার হিসেব না করার সময়। মেয়ের বিয়েতে দু'হাতে খরচ করতে চায়। খুব ধুমধাম হোক। এলাহি আয়োজন দেখে পাড়ার লোকরা জ্বলে-পুড়ে খাক হয়ে যাক।

ময়মনসিংহ এসে থেমে যায় ট্রেন। সামনে কারা নাকি রেললাইন উপড়ে ফেলেছে। এ নিয়ে ঝামেলা হচ্ছে খুব। ট্রেন ছাড়তে দেরি হবে। গত কয়েকদিনের মাঝে সোলায়মান সাহেব এই প্রথম একটু মন খারাপ করেন। বাড়ি যেতে দেরি হলে বিপদ।

মন ভালো করবার জন্য একটা ভালো রেস্টুরেন্টে ঢোকেন। ভালো-মন্দ খেলে মন ভালো হয়। খেতে এসে রুই মাছ, ভর্তা, কোয়ার্টার মুরগি আর ভাজি অর্ডার দিয়ে যখন তিনি বেসিনে হাত ধুতে যান তখনই পরিচয় হয় ইশতিয়াকের সাথে।

ছেলেটার বয়স অল্প। ভালো চাকরি করে। চেহারা প্রায় রাজপুত্রের মতন। শুধু মাথার চুল একটু বিশ্রী রকমের কোকড়া আর গায়ের রং ময়লার দিকে। সে'ও খেতে এসেছে এখানে। একই টেবিলে পাশাপাশি চেয়ারে বসে কথা হয় দুজনের।

'কোথায় যাচ্ছেন আপনি?' রুই মাছের কাঁটা ছাড়াতে ছাড়াতে কথা শুরু করে ইশতিয়াক।

'মুক্তাগাছা। নিজের বাড়ি। মেয়ের বিয়ে। তুমি? তুমি করেই বললাম। বয়স কমতো। হা হা।' সোলায়মান সাহেবের কথা বলার কাউকে পেয়ে মন আবার ভালো হতে শুরু করে। ট্রেনের ঝামেলাটা ভুলে থাকার চেষ্টা করেন তিনি।

'আমিও মুক্তাগাছা যাচ্ছি। ঘুরতে। ঘুরবো, মণ্ডা মিঠাই খাবো এই আর কি।'

'ধুরও। মুক্তাগাছায় ঘোরার মতন কিছু নাই। জমিদার শশাঙ্কের একটা ভাঙাচোরা প্রাসাদ আছে। আর কিছু নাই। ময়মনসিংহ যাবাতো। কৃষি ভার্সিটি দেইখা যাইও। ভালো জায়গা নিয়া করা।' রুই মাছে স্বাদ হয়েছে। কথা বলতে বলতে আরেক পিস মাছের অর্ডার দেয় সোলায়মান সাহেব।

ইশতিয়াক কম খায়। সালাদ এই ছেলের পছন্দ। প্লেটে যতটুকুন ভাত তার চেয়েও বেশি সালাদ। ছেলেটাকে পছন্দ হয় সোলায়মান সাহেবের।

'নদীটা নাকি সুন্দর। ভার্সিটির পাশেই নাকি?' সালাদ মুখে দিয়ে বলে ইশতিয়াক।

'নদী-ফদী নাই এখন আর। শুকাইয়া খাল হইছে। দেখার কিছু নাই।' মুরগির হাড়ের ভেতরের ক্যালসিয়াম সোলায়মান সাহেবের প্রিয় খুব। দাঁত দিয়ে হাড় ভাঙতে থাকে সে। হাড়ের গায়ে লেপ্টে থাকা সামান্যটুকুন ক্যালসিয়ামও রেহাই পায় না।

'মেয়ের ছেলে কি করে? মানে যার বিয়ে তার।'

'ব্যাংকার। সরকারি ব্যাংকের সিনিয়র অফিসার। ভালো ছেলে। চেহারা ভালো। হাইট ভালো। তুমি কর কি বাবা? চাকরি-বাকরি?'

'পড়াশোনা শেষ হলো মাত্র। চাকরি খুঁজছি।'

'আমার বড় ছেলেটার তো চাকরিই হইল না। পড়াশোনাই হয় নাই তো চাকরি কই দিয়া হবে। সারাদিন ক্যারম খ্যালে। জুয়া খ্যালে। এই ছেলে দিয়া কি হবে। কিচ্ছু হবে না।' খাওয়া শেষ হয়। সোলায়মান সাহেব ওঠেন। ছেলের কথা বলতে গিয়ে মন ভার হয়। ছেলেটা তার মানুষই হলো না। চেষ্টার কোনো ত্রুটি ছিল না। সে আর তার স্ত্রী কম চেষ্টা তো করেনি। ছোটবেলা থেকে সব আবদারই পূরণ করেছে ছেলেটার। তার দুই ছেলে আর দুই মেয়ে। বড় ছেলের মতন ছোট ছেলেরও কিছু হলো না জীবনে।

ছেলেটা মনে হয় নেশা ধরেছে। কেমন উদভ্রান্তের মতন থাকে সবসময়। বাসায় এসে মায়ের সাথে ঝগড়াঝাটি করে। এটা ওটা ভাঙে। এসব ভালো লাগে না সোলায়মান সাহেবের। তার মেয়ে দুটো বড় লক্ষ্মী। বড় মেয়েটি পড়াশোনায় ভালো। সাত চড়েও রা নেই এই মেয়ের। মেয়েটার জীবন সুখের হয়নি। দেখেশুনেই বিয়ে দেওয়া হয়েছিল মেয়েটাকে। পরে গিয়ে দেখা গেল মেয়ের শ্বশুর বাড়ির লোকজন ভালো না। ছেলে অবশ্য যৌতুক টৌতুক চায়নি কখনও। ঝামেলা হয়েছে অন্য জায়গায়।

বড় মেয়ে বিয়ের এক বছরের মাথায় অই পরিবারের দুইজন লোক মারা গেছে। শ্বশুর ব্যবসায় মার খেয়েছে। সেই থেকে শ্বশুরবাড়ির লোকজন বড় মেয়েটাকে অলক্ষ্মী ভাবতে শুরু করেছে। মেয়ের সাথে বর কথা বলা বন্ধ করে দিয়েছে। এসব নিয়ে মানসিক যন্ত্রণায় আছে সোলায়মান সাহেব। বড় মেয়ে আর তার বরকে বোঝানো হয়েছে অনেকবার। সম্পর্কের বরফ অবশ্য গলেছে কিছুটা। মেয়ের সাথে ছেলের সম্পর্ক ভালো হলেও শ্বশুরবাড়ির লোকজন আগের মতনই আছে। মেয়ে বাবার কাছে এসে কান্নাকাটি করে। মাকে দুঃখের কথা বলে। সোলায়মান সাহেবের এসব ভালো লাগে না।

ছেলেমেয়েদের ক্ষেত্রে তার কপাল ভালো না। তার সুখী হওয়া হলো না। ছোট মেয়েটার বিয়েটাও ঝামেলায় পড়ে দেওয়া হচ্ছে। সোলায়মান সাহেবের বউ টের পেয়েছে ছোট মেয়েটা প্রেম করছে কারও সাথে। সারারাত দরজা আটকে ঘরের ভেতর কুটুর কুটুর করে গল্প।

প্রেম-পিরিতি অপছন্দ সোলায়মান সাহেবের। ছোট মেয়ের প্রেমের বিয়ে হোক এটা তিনি চান না। তাই তাড়াহুড়ো করেই বিয়ে দেওয়া হয়েছে। একটা ভালো ছেলেও পাওয়া গেছে। ছেলের পরিবারের আর্থিক অবস্থা তেমন ভালো না। ছেলে ভালো তাই পরিবার টরিবার নিয়ে আর ভাবেনি সোলায়মান সাহেব। আজকাল ভালো ছেলে পাওয়া যায় না।

ইশতিয়াক আর সোলায়মান সাহেব রেস্টুরেন্ট থেকে বের হন। সোলায়মান সাহেবকে মনমরা দেখে কথা বাড়ায় না ইশতিয়াক। কথা শুরু করে সোলায়মান সাহেবই। দোকান থেকে একটা পান কিনে মুখে পুরে সে। ইশতিয়াককেও পান খেতে বলে। ইশতিয়াক খায় না। তার এসব বদ অভ্যাস নেই। পান-সিগারেট কোনোটাই তাকে টানে না।

‘আমার মেয়ের নাম যূথী। খুব ভালো মেয়ে। মেয়েটা পরের ঘরে চলে যাবে। মন খারাপ হয়।এত তাড়াতাড়ি বিয়ে তো দিতে চাই নাই।’

‘কেন দিলেন?’

‘মেয়ে প্রেম ট্রেম করে মনে হয়। এইসব আমার পছন্দ না। চা খাবা?’

‘জ্বি। খাওয়া যায়।’ ইশতিয়াক সোলায়মান সাহেবের সাথে চা খেতে যায়। চায়ের বিলটা ইশতিয়াকই দেয়।

‘ট্রেন ছাড়ার নামই তো নাই। টেনশনে আছি। মেয়ের বিয়ে। তাড়াতাড়ি বাড়ি না গেলে বিপদ।’

‘বুঝতেছি না। লাইন ঠিক করার লোকজন আসছে।’

সোলায়মান সাহেবের সাথে টাকা-পয়সা আছে প্রচুর। তাছাড়া বিয়ের উপহারসামগ্রীও কম নেই সাথে। ইচ্ছে করেই তিনি ইশতিয়াককে সাথে রাখেন। ছেলেটাকে নিরাপদ মনে হয়। এই ছেলেটা সাথে থাকলে ভয় কম।

একটু পরেই জানা যায় লাইন ঠিক করতে আরো ঘণ্টাখানেক লাগবে। কারা যেন লাইনের ওপর বড় বড় গাছের গুঁড়িও ফেলেছে। এসব সরাতে পুলিশ এসেছে। সময় লাগবে সবকিছু ঠিক হতে। যাত্রীদের ভেতর আতঙ্ক ছড়াতে থাকে। কেউ কেউ গুজব ছড়ায় ডাকাত পড়বে। ডাকাতের ভয়ে বগির ভেতরেই নিজেদের মালামাল কোলের ভেতর নিয়ে বসে থাকে বেশিরভাগ যাত্রীরা।

আকাশ কালো হয়ে আসে। একটু একটু মেঘ অগোছালোভাবে ছড়িয়ে পড়ে আকাশে। গরম পড়েছে খুব। বৃষ্টির দরকার। বৃষ্টি হোক চায় সোলায়মান সাহেব। শরীরটা একটু ঠাণ্ডা হবে। টেনশন কমবে। শান্তি আসবে।

সোলায়মান সাহেবের জীবনে শান্তি নেই। জীবনে সুখী হতে পারলেন না কখনও। বউকে কখনও বুঝতে পারেননি। বোঝার চেষ্টাও করেননি। সংসারতো করেছেন অনেকদিন কিন্তু বউয়ের মনে ডুব দেওয়া হলো না। শরীরে শরীর মিললেও মনের সাথে মন মিললো না।

ঘর আলো করে সন্তানরা এলো। সোলায়মান সাহেব ভাবলেন এবার দুঃখ ঘুচবে। ছেলেমেয়েদের মানুষ করার জন্য পাগল হলেন। কিছুই হলো না। বড় ছেলে হলো জুয়াচোর আর ছোট ছেলেটা নেশাখোর। বড় মেয়েটার জীবন সুখের হলো না। ছোটটারও হবে বলে মনে হয় না। তাড়াহুড়োর বিয়ে ভালো হয় না। ছেলের পরিবার ভালো না। এসব দুর্বলতা লুকাচ্ছে সোলায়মান সাহেব। মানুষকে এসব বলা যায় না। এত তাড়াতাড়ি করে ভালো ছেলে পাওয়া কঠিন না অসম্ভব একটি কাজ। মেয়েটা প্রেমিককে বিয়ে করলেই হয়তো ভালো করত। সোলায়মান সাহেবের মন খারাপ হলেও তিনি হয়তো খুশিই হতেন।

সোলায়মান সাহেবের জীবনে প্রেম এসেছিল। তীব্র প্রেম। জীবনের আর সব স্বপ্নকে জলাঞ্জলি দিয়ে প্রেমের জন্য ছুটেছিলেন। লাভ হয়নি। মেয়ে অন্য কারো হয়েছে। মেয়ের বাবা জোর করে অন্য কোনো ছেলের সাথে বিয়ে দিয়েছে।

সোলায়মান সাহেব সেই যে ভেঙে পড়েছেন আর মাথা তুলে দাঁড়াতে পারেননি। শিরদাঁড়া ভেঙে গেলে আরতো দাঁড়ানো যায় না। সোলায়মান ভীরু, কাপুরুষ। কোনোরকমে টেনে এনেছেন এক জীবন।

প্রেমে ব্যর্থ হয়ে প্রেমের ঘেন্না ধরে গেছে একদম। তার সন্তানের জন্য তাই এসব নিষেধ। মেয়ে হাত কাটলেও, প্রেমের জন্য হারপিক মুখে দিলেও, ঘুমের ওষুধ খেলেও এসব মানবেন না তিনি। মানেনও নি। সত্যি হলো তিনি জোর করে বিয়ে দিচ্ছেন মেয়ের। মেয়ের প্রেম হত্যা করে আনন্দ পাচ্ছেন।

‘ট্রেন আর ছাড়বে না মনে হয়। রাত মনে হয় এই জায়গাতেই কাটাইতে হবে। ভালো, সমস্যা কি বলো?’ সোলায়মান মেয়ের বিয়ের আনন্দ নিতে চান। সব কষ্ট ভুলতে চান। ইশতিয়াকের সাথে আড্ডা তাকে এই কাজে সাহায্য করে।

‘ট্রেন ছাড়বে। বেশিক্ষণ লাগবে না। শুনলাম লোকজন বলাবলি করছে।’ ইশতিয়াককে কেন জানি চিন্তিত মনে হয়। উশখুশ করছে।
ইশতিয়াকের আচরণে সোলায়মান সাহেব অবাক হন। তাদের বগিটা খালি। যে দুইজন লোক ছিল তারাও কিছু খাওয়ার জন্য বের হয়েছে। আতঙ্ক কেটেছে। কতক্ষণই বা ভয় নিয়ে থাকা যায়। যাত্রীদের অনেকেই বগিতে নেই। বাইরে ঝামেলার আওয়াজও কানে আসে। কোনো একটা কিছু ঝগড়া শুরু করে লোকজন।
‘কাউকে নিয়া, কোনো কিছু নিয়া টেনশন তোমার বাবা?’ ইশতিয়াককে বলে সোলায়মান সাহেব। কোনো কারণ ছাড়াই ভয় পায় লোকটা।
‘জ্বি। যূথীকে নিয়ে টেনশন।’ কথাটা বলেই নিজের সিট থেকে উঠে দাঁড়ায় ইশতিয়াক। কিছু একটা শক্ত করে চেপে ধরে সোলায়মান সাহেবের নাকে। নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে আসে সোলায়মান সাহেবের। চোখের সামনে সবকিছু ঝাপসা হয়। একটা সময় গাঢ় অন্ধকার। আর কিছু মনে পড়ে না।

২.

ট্রেনের বগিতে লাশ পড়ে থাকে। জীবনের শুরুতে প্রেমে ব্যর্থ সোলায়মান সাহেবের লাশের কথা এলাকার লোকজনের জানতে দেরিই হয়। মেয়ের বিয়ে থেমে থাকে না। গায়ে হলুদের অনুষ্ঠান সোলায়মান সাহেবকে ছাড়াই হয়। পরিবারের জন্য হয়তো তিনি এমন গুরুত্বপূর্ণ কেউ নন যে তার জন্য বিয়ে থেমে থাকবে। প্রেমে ব্যর্থ ইশতিয়াকও। যূথীকে না পেয়ে তার বাবাকেই মেরে ফেলার সিদ্ধান্ত নেয় ছেলেটা। প্রেমে ব্যর্থ মানুষগুলো এমনই। না পেয়ে সারাজীবন তারা প্রেমকে ঘৃণা করবে। কাপুরুষ বলে আরেকবার ভালোবাসার সাহস দেখাবে না। কোনো এক নতুন মনে আশ্রয় নেওয়ার চেষ্টা করবে না। প্রেমে ব্যর্থ মানুষরা সুখী হয় না। তারা গায় শুধু অসুখের গান।
অসুখী সোলায়মান সাহেবের লাশে পিপড়া এসে ভিড় করে। লাশে পচন ধরবার আগেই। আর ইশতিয়াক এর কি হয়, কোথায় গিয়ে পালায় এসব কিছুই জানা যায় না। শুধু জানা যায় ইশতিয়াক সুখী হতে পারেনি, পারবে না। সুখ সবার জন্য নয়। ইশতিয়াক আর সোলায়মান সাহেবের জন্য তো নয়ই...।

কল্পদৃশ্য

কোলাহলের কারাগার :

ক.

অনেক জোড়াতালির পর বাড়িটা দাঁড়িয়েছে মাত্র। জানালাগুলো অমসৃণ কাঠে ঢেকে দেয়া। ইটের শরীরজুড়ে কাঁচা সিমেন্টের ঘ্রাণ। সদর দরজার পাশে ভাঙা সুরকি, বালু। এ আমাদের নতুন সংসার। আমি আর বাবা। ঘুম ভাঙলেই মাখনভর্তি বাটারবন আর তিতকুটে রং চা। চোখে পিচুটি নিয়ে চাল বাছা দেখি। আমার হাসি পায়। মাকে দেখেছি এসব কাজ করতে। পুরুষ মানুষের কি এসব মানায়! মা দেখলে মুখে আঁচল চাপা দিয়ে হাসত আর বলত 'এভাবে আর কদ্দিন। বিয়ে করো আর আরেকটা।' প্রতিদিনই অঘটন। মাছ কুটতে গিয়ে হাত কেটে ফেলে। মুরগির ঝোল পাতিলেই উবে যায়। নুন বেশি পড়ে তরকারিতে। প্রতিদিন বাঁধাধরা এক খাবার ডিমভাজি। শরীর থেকে ডিম ডিম গন্ধ পাই। সূর্য রোদের শামিয়ানা পাতার আগেই বাবা দুম করে উধাও। অফিস। দিনভর কী এক জঘন্য কাজ করে কে জানে! ভাল্লাগে না। মনজুড়ে আমার আকুলি-বিকুলি। ক্লাস? সে তো সেই দুপুরে। কী করি আমি। তোপখানা রোডে আমাদের বাড়ি। ধার দেনা করে মাথা গোঁজার এ ঠাঁইটুকু পেয়েছে বাবা। বরিশালের পাঠ চুকিয়ে মায়ের এখানে আসতে ঢের দেরি। মধ্যবিত্তের তৃপ্তি সামান্যতেই। বাবা আজকাল বাবুই পাখি হয়ে গেছে। কাজ শেষ হতে না হতেই তার আসা চাই এ ভাঙা প্রসাদে। হোক না সে বাসার কল থেকে টিপ টিপ করে জল ঝরে সারাক্ষণ, হোক না তার জানালার ফাঁক গলে হু হু করে ঢোকে শহুরে কোলাহল। মাঝেমধ্যে ঘরে তালা দিয়ে বের হয়ে যাই। অচেনা শহর। নোংরা, আঁশটে। দম বন্ধ হয়ে আসে। পরিচয়ের শুরুতেই পর করে দেয়। এ শহর আমার নয়। একদম না। আমি শামুক হয়ে যাই। নগরের কনিষ্ঠ শামুক। আমার মনের পরতে পরতে লজ্জা। খোলসে মুখ লুকিয়ে রাখি সব সময়। সচিবালয়ের সামনের দেয়ালে ঠাসা পেপারগুলো পড়ি। মুখস্থ হয়ে যায় কালো অক্ষরগুলো। বাবা জানলে বলত, 'পড়ার বই মুখস্থ হয় না তোমার। আর এগুলো ....। সব ঠোঁটস্থ ছিল আমার। পরীক্ষায় ফার্স্ট হতাম।' আচ্ছা, সব বাবাই কি ফার্স্ট হন! সবার মুখে যে একই কথা। এখানে মাঠ নেই। নেই পুকুর। আছে শুধু অজস্র রিক্‌শা আর গাড়ির বহর। ফুটপাতজুড়ে নোংরা পত্রিকা বিক্রি করা মানুষ। ঝালমুড়ি, ভেলপুরি, শিক কাবাবের পোড়া লাল-খয়েরি রং মেশান মাংস। টাইপ রাইটারের কুৎসিত খটখট শব্দ। ওলটপালট সব। শান্তি নেই ইশকুলেও। দৌড়ে ফিরি বাড়ি। বাড়িতে আমার জন্য অপেক্ষা করে আছে কংক্রিটের দেয়ালগুলো। কত কথা ওদের সঙ্গে। না বলতে পারলে তো পেট ফেটে মারা যাব। দে দৌড়।

খ.

বাবা রাত জাগতে পারে না। পাশে শুয়ে নাক ডাকে। শরীরে তার লেপটে আছে শুকনো ঘাম। বাবুই পখিটা বড় ক্লান্ত। আমি একা পড়ে থাকি বিছানায়। বড্ড একা। একটা সময় কোলবালিশে মুখ গুঁজে ডুকরে কেঁদে উঠি। বলি 'ও বাবা, আমায় একটা মাঠ দাও, ঘুড়ি ওড়াব। দাও পুকুর, হাত-পা মেলে জল কেটে সাতার কাটব। মাছেদের সঙ্গে গল্পজুড়ে দেব। এ কোলাহলের কারাগারে থাকব না আর। একটা সেকেন্ডও না।' বাবা ঘুমে কাদা। শোনার সময় কই তার।

সোনার হরিণ :

স্কুল থেকে ফিরেই আর পাওয়া যেত না আমাকে। পড়িমরি করে ছুটতাম খেলার মাঠে। বুনো ফুল-ঘাস মাড়িয়ে, লজ্জাবতীর ঘুম ভাঙিয়ে শুধু ছোটাছুটি। মাটিতে চিৎ হয়ে শুয়ে আকাশ দেখতাম। মাঝদুপুরে মেঘগুলো রোদের অলঙ্কার গায়ে জড়িয়ে চেয়ে থাকত আমার দিকে। লজ্জায় চোখ বুজতাম। এই এতটুকুন আমি তাই বলে কি আমার লজ্জা থাকতে নেই। মা বোঝেন না। রাতে বিছানা ভেজানোর দুর্ঘটনাটা না-হয় হয়েই গেছে। তাই বলে কি অমন করে হাসতে হয়! মুখপোড়া বোনটাও তাল মেলায়। রাগে পিত্তি জ্বলে যায়! আর যদি কখনো ওর জন্য কাঁচা তেঁতুল, চালতার আচার এনেছি তো আমি একটা হনুমান। একদম যাচ্ছেতাই মেয়েটা। মায়ের শাড়ির আঁচলের খোট থেকে পয়সা চুরি করে স্যাকারিন দেওয়া আইসক্রিম কিনে খাই। এটা জানতে পারলেই বাড়িতে বলে দেয়। আমার মায়ের পয়সা দিয়ে স্যাকারিন না কেরোসিন খাই, তাতে তোর কিরে ডাইনি বুড়ি! বুড়িটা বলে, 'বড় বোনের সঙ্গে এমন করতে নেই। বিয়ে হলে পরের ঘরে চলে যাব। তখন তোর অনেক খারাপ লাগবে।' বিয়ের জন্যে অপেক্ষা করি। ও চলে গেলে মা বাবার সব আদর আমার। ভাবতেই ভালো লাগে। কথার পিঠে খেপে গিয়ে বলি, 'যা, দূর হয়ে যা, তোর বিয়েতে আনন্দে ধেই ধেই করে নাচব। কাঁদব না একটুও।' বিকেলের দিকে বোমবাস্টিং খেলাটা জমতো। পিঠে ব্যথা নিয়ে কোঁকাতে কোঁকাতে ফিরতাম বাড়ি। মাকে বুঝতে দিতাম না। ব্যথার কথা জানতে পারলে রক্ষে নেই। পড়তে ভালো লাগে না। নতুন বইয়ের গন্ধে নাক ডুবিয়ে রাখতাম। মা শুধু বলেন, 'পড় সোনা। অনেক পড়লে তুই রাজা হবি। সোনার হরিণ পাবি।' আমি রাজা হওয়ার জন্যে পড়ি। ঘুমে ঢুলুঢুলু হয়ে বোনের সঙ্গে মায়ের কোলে মাথা রাখি। মা গল্প বলে যান। তিন জোনাকি, মুকুট মাথায় দেওয়া রাজা আর সোনার হরিণের গল্প। আমার রাজা হতে ইচ্ছে করে। সোনার হরিণের পিঠে চড়ে ঘুরে বেড়াতে চাই। মা হঠাৎ গান ধরেন, 'তোরা যে যা বলিস ভাই, আমার সোনার হরিণ চাই।' কী দারুণ গলা। বাবা মানুষটা গোমড়ামুখো। মায়ের ওষুধের শিশিটা ভাঙার জন্য কি মারটাই না মারল আমায়। বরইতলায় গিয়ে অনেক কাঁদলাম। মা ও বোন খাওয়ার জন্য ডাকতে এসে ফিরে যান। আমার সেকি জেদ, খাব না বলে পণ করেছি! এক সময় বাবা এসে বললেন, 'আর রাগ কোরো না,খেতে চলো।' সব ভুলে বাবার কোলে মুখ লুকিয়ে হাউমাউ করে কেঁদে উঠলাম তখন। মুঠোভর্তি নকুলদানা কিনে দিলেন বাবা সেদিন। এমন সুখে-ভেজা দিনগুলোতে ধাইধাই করে বড় হই। বেয়াড়া মেঘ, টুনটুনি, মস্ত খেলার মাঠ, চিনি গোলানো জলে ডুবো ডুবো চালতা সব ফিকে হয়ে

যায়। মায়ের শরীরের মমতাভরা ঘ্রাণ নিয়ে ঘুমুতে চাই। হয় না। বোনটাও বিরক্ত করে না আর। পরের ঘরে গিয়ে করবেই বা কী করে, বিয়ে হয়েছে অনেকদিন। কসম বলছি, বুড়ির বিয়েতে গোপনে পাগলের মতো কেঁদেছি। প্রকৃতি আমাকে বড় করে দেয়। মাঝরাতে বোবা ভূতে ধরলে এখন আর পাশ ফিরে মাকে দেখতে পাই না। অভিমান হলে হাত পাতি। নকুলদানার নাগালও পাই না। দিনভর কাজ। মায়ের কথামতো আমাকে যে রাজা হতে হবে। বুকের ভেতর বহুদিন ধরে পুষে রাখা কথাটা তাই গোপনই থাকে। নিজের ঘরের নিঃসাড় দেয়ালে সেটা ধাক্কা খেয়ে একাকী আনমনে বারেবার বলে যায়, 'মা-মাগো, আমি তো রাজা হতে চাই না। মানুষ হতে চাই...।

কড়ি খেলিবার ঘর

ক.

আকাশে মস্ত বড় বাঘ।
বাঘটা ভাল্লুক হয়ে যায়। ভাল্লুক থেকে বানর, দাদুর চোখের ডাটভাঙা চশমা, ঠোঁটে শরপুঁটি নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকা বক, তুলতুলে বিড়াল ছানা তারপর আবার বাঘ হয়ে যায়।
বারান্দার নকশা কাটা গ্রিলের ভেতর দিয়ে এসব দেখতে দেখতে অবাক হয় তূর্ণা মামনি।
মেঘের ভেতর ডুব দিয়েছে আস্ত একটা দুনিয়া। সেই দুনিয়ায় বাস বাঘ, ভাল্লুক পেঁচা আরও কত কি'র ! তারা একটু পরপর চেহারা দেখিয়ে মিলিয়ে যায় আবার মেঘেরই ভেতর।
অবাক লাগে। তূর্ণা অবাক হয়।
সহসাই সন্ধ্যা নেমেছে। একটু পরেই নামবে আঁধার।
আঁধার নামলেই তূর্ণাকে নিজ ঘরে যেতে হবে। তখন আর বারান্দায় থাকবার জো নেই। বাবার তৈরি করা আজগুবি সব নিয়ম।
বারান্দাটাই তূর্ণার ভালো লাগে সবচেয়ে বেশি। ইশ, এটাই যদি ঘর হতো তার !
তূর্ণার মনমতো কিচ্ছুই হয় না। কখনো না। ছোট তাই তার খুব কষ্ট।
সে কাঁদে। মাঝে মাঝেই কাঁদে। এই যেমন এখন কাঁদছে।
পায়ে কাচ ফুটেছে তূর্ণার। রক্তে মাখানো বারান্দার মেঝে। কি সুন্দর মোজাইকের ওপর রক্তের লাল রং!
'ত' এ দিরগু 'তূ' আর 'ণ' এর ওপর 'রেফ' দিয়ে আকার।
রক্তে ভেজা পা'টা ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে মেঝেতে নিজের নামটা লিখে ফেলে নয় বছরের মেয়ে তূর্ণা।
ঠিক ঠিক বানানে তার নিজের নামটা লিখতে ভুলভাল হয় না একটুও।
বাবা দেখলে খুশি হতো। তূর্ণা বানানে ভুল না করলে বাবা খুবই খুশি হন। তবে রক্ত দেখলে ভয় পেত। বাবা পাগল আছে। তূর্ণা সামান্য ব্যথা পেলে, জ্বর হলে উতলা হয়ে ওঠে। তূর্ণাকে বুকের মধ্যে নিয়ে বসে থাকে। তূর্ণাও বাবার শরীরে চুপটি করে ঘুমায়। কেমন ওম ওম বাবার শরীরটা। ঘুম চলে আসে।
বাবা ভালো। সবার থেকে ভালো। সবচেয়ে সেরা। মা'টা পঁচা। মা তূর্ণাকে বকে। মা কেমন যেন। অনেক রাত করে বাড়ি ফেরে। প্রায় প্রতিদিনই এক রুটিন। বাড়ি এসেই ঝগড়া করে বাবার সাথে। ভাঙচুর হয়। মা গলা চড়ায়। বাবাও না পেরে চিৎকার করে মাঝে মাঝে। একটু ধস্তাধস্তিও হয়। আওয়াজে ঘুম ভেঙে যায় তূর্ণার। কিন্তু সে ঘুমের ভান করে পড়ে থাকে বিছানায়। এমনটাই নাকি নিয়ম।

এই কথা বলেছে কাজের বুয়াটা। কাজের বুয়া সালেহার সাথেই তূর্ণার থাকা হয় সারাদিন। সালেহা খালার সাথেই তার হাজারো গল্প। তাকে মা-বাবার সব গল্পগুলো বলে তূর্ণা। সালেহা মনযোগ দিয়ে শোনে। তারপর পিচিক করে পানের পিক ফেলে বলে 'দুকখো কইরো না। তোমার মায়ের চরিত্রে দোষ আছে। বাপটা ভোলাভালা। কি কইরবা! কপালের লিখন!'

চরিত্র কি সেটাই তূর্ণা বোঝে না। এতটুকু জ্ঞান হয়নি তার। বাবাকে ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করেছিল একবার। বাবা রাগ করেছে। জানতে চেয়েছে চরিত্র কথা সে কার কাছে শুনেছে।

তূর্ণা বলেনি। সালেহা বুয়া তার বেস্ট ফ্রেন্ড। বেস্ট ফ্রেন্ডদের মধ্যে কিছু গোপন ব্যাপার থাকে। এসব তাদের ব্যাপার। গোপন কথা কাউকে বলা যায় না। বলা উচিত না।

বাবা বুঝেছে এটা সালেহা বুয়ার কাজ। তাই বকে দিয়েছে আচ্ছা করে। বুয়া মন খারাপ করে সেদিন সারাদিন কাজ করবার সময় গজ গজ করেছিল। বারবার বলেছিল, সে চলে যাবে, চলে যেতে চায়। চলেই যেত শুধু তূর্ণার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকছে এ বাসায় এখনও।

বাবা খুব সকালে অফিসে চলে যায়। যাবার সময় তূর্ণার কপালে চুমু খায়। যত রাতেই ঘুমাক না কেন তূর্ণা ঘুম থেকে ওঠে সকালে। রুম লাগোয়া বারান্দা থেকে আলো এসে পড়ে তার কপালে, চোখে, মুখে। খুব ভালো লাগে। ছোট্ট তূর্ণার এই সকাল খুব ভালো লাগে। বাবার আদর ভালো লাগে।

মা তাদের সাথে ঘুমায় না কয়েক সপ্তাহ হলো। আলাদা রুমে শোয়। বাবা অনেক অনুরোধ করেছিল সাথে থাকার। মা শোনেনি। রাতে বাড়িও আসে না কখনও কখনও। সালেহা বুয়া বলেছে সে নাকি পরপুরুষের সাথে থাকে। মা তার ভালো না। মাকে ঘৃণা করা উচিত।

তূর্ণা মাকে ঘৃণা করতে পারে না। সে মাকে ভালোবাসে না। মা তার সাথে থাকেই না। মায়ের সাথে তার কোনো গল্প নেই। মন খারাপ হলে সে মায়ের কাছে যায় না। তাই মাকে নিয়ে তার কোনো ভাবনা নেই। সে বাবাকে ভালোবাসে। বাবার জন্য তার রাজ্যির চিন্তা। বাবা যখন মায়ের সামনে হাটু গেড়ে বসে কাঁদে তখন আড়াল থেকে দেখে তূর্ণার চোখে জল আসে। বাবাকে এভাবে কষ্ট পেতে দেখে ভালো লাগে না। শুধু এই সময়টায় মায়ের ওপর রাগ হয়।

বাবার সাথে মায়ের প্রেমের বিয়ে। সালেহা বুয়া বাবা আর মায়ের বিয়ের গল্প বলে। কতটুকুন এর সত্যি কে জানে! মা নাকি অন্য ধর্মের। হিন্দু। অতশত বোঝে না তূর্ণা। গল্পের অনেক কিছুই না বুঝলেও চুপচাপ করে শুনে যায় শুধু। সালেহা বুয়াকে গল্প নিয়ে কিছু জিজ্ঞেস করলে বিরক্ত হন তিনি।

তিনি এভাবে গল্প শুরু করেন, 'বুঝলা তূর্ণা মা, বিশাল হিস্টরি। তুমার মুসলমান বাপ বিয়া করছে এক হিন্দু মাইয়ারে। তওবা তওবা। ইস্টুডেন্ট থাকনের সময় ভালোবাসা। ফ্যামিলির না শুইনা বিয়া। তোমার বাপের তখন নাই চাকরি। অনেক কষ্ট হইয়ে তহন। আমি কিন্তু এইসব ঘটনের সময় আছিলাম। তুমি জন্মের পর আমি আইছি। তোমার মায়ই চাকরি দিছে। তহন ভালোই আছিল। কি যে হইল পরে। আমি এত কিছু জানিও না ঠিক। শিক্ষিত মাইনষের কাম কারবার বুঝন দায়। কিছু কাহিনী শুনছি আর কিছু অনুমান কইরা হিস্টরিডা বুঝছি। তোমার বাপে ভালো মানুষ। আহারে, ভালো মানুষটার কষ্টের জীবন। টাকা পয়সা থাকলে কি হইব, মনে শান্তি নাই মাগো। মনে শান্তি নাই।'

তূর্ণা মনযোগ দিয়ে সবটা শোনে। সালেহা খালা যখন মন খারাপ করে তখন তার সাথে তাল মিলিয়ে তূর্ণাও মন খারাপ করে।

ব্যথা হয় তূর্ণার। এই এতক্ষণে। মেঝের রক্ত শুকিয়ে যাচ্ছে। মেঝের ওপর কেমন ফ্যাকাসে হয়ে লেপ্টে আছে। রক্ত ভেজা ভেজা থাকলেই ভালো লাগে। লালটা গভীর থাকে। চোখ আটকে যায়। কাঁদেনা আর তূর্ণা। কান্না

থামে। রক্তপড়া বন্ধ হলেও ব্যথা বাড়ে। তূর্ণার ইচ্ছে হয় বাবাকে ডেকে ব্যথার কথা বলতে। বাবা ওষুধ নিয়ে আসত। এখন বলা যাবে না। পাশের ঘরেই ঝগড়া করছে বাবা আর মা। মায়ের চিৎকার শোনা যায়। মা আগের রাতে বাড়ি না ফেরায় ঝামেলা। কোথায় কার সাথে থেকেছে জানতে চায় বাবা। কি দরকার এতসব জেনে। মা বাড়িতে না আসলেই বা কি আসে যায়! মা খুব করে ডাকলেও কাছে যেতে চায় না তূর্ণা। তাকে যখন আদর করে তখন মেজাজ খারাপ হয়। ভালো লাগে না। মাকে খুব ভয় লাগে। তাই এড়িয়ে চলাই ভালো মনে করে।

আজকের ঝগড়াটা বেশি মনে হয়। ভাঙচুরের আওয়াজ একটু পরপরই শোনা যায়। ঘরের কাঁচের জিনিসপত্র কিছুই আর অবশিষ্ট থাকবে না। সালেহা বুয়াও বাসায় নেই। তার ছেলের ঘরের নাতিটার শরীর ভালো না। আগে আগেই চলে গিয়েছে আজ। দুপুরে ভালোমত খাওয়ানোর সময়ও পায়নি বুয়া। কম খাওয়ার কারণে এখন ক্ষিধে পেয়েছে তূর্ণার। ভীষণ ক্ষিধে।

বাবার কাছে যাওয়া দরকার। ক্ষিধের কথা বলতে হবে। কিন্তু মা আছে যে। ভয় হয়। ভয় পেয়ে ক্ষিধে চেপে রাখে মেয়েটা। বাইরে কমে এসেছে আলো। গ্রিলের ভেতর দিয়ে আঁধার এসে হাত বাড়ায়। সন্ধ্যে শেষ হয়ে রাত হবে কিছুক্ষণের ভেতরেই। আকাশের শরীরে থেকে মেঘেরা বাঘ, ভাল্লুক হওয়ার খেলা বন্ধ করে। সালেহা বুয়া নেই বলে আজ কেউ ঘরে আলোও জ্বালায়নি।

প্রতিটা রুম অন্ধকার। অন্ধকার এসে একটু একটু করে তূর্ণার রক্তে লেখা নাম গ্রাস করতে চায়। মুছে দিতে চায়। তূর্ণার পায়ে ব্যথা। তূর্ণার পেটে ক্ষিধে। তূর্ণা বাবাকে মিস করে। তূর্ণার ভালো লাগে না। সালেহা খালার কাছে গিয়ে তূর্ণার বলতে ইচ্ছে করে মা পচা। বাবাকে কষ্ট দেয়। প্লিজ মাকে চলে যেতে বলো। আই হেইট ইয়্যু এমন মা। অনেক অনেক অনেক হেইট ইয়্যু। তারপর সে একটু কাঁদতে চায়। এই কান্না রাগ থেকে আসবে। মায়ের ওপর রাগ থেকে আসবে।

বাবা এখন কাঁদছে। জোরে জোরে কাঁদছে। আওয়াজ পাওয়া যায়। তূর্ণা জানে কান্নার একটু পরেই ঝগড়া থামবে। এমনই হয়। বাবা কাঁদতে একটা সময় চুপ মেরে যায়। মা তারও পর আরো কিছুক্ষণ চিৎকার করে। বাবাকে গালিগালাজ করে। তাকে লুজার বলে। তারপর একটা সময় ক্লান্ত হয়ে নিজেও থামে। চলে যায় অন্য ঘরে। অনেক রাত পর্যন্ত ফোনে কথা বলে। গান শোনে। তারপর ঘুম।

বাবা তূর্ণাকে ঘুম পাড়িয়ে দেয়। কান্নার কারণে তার চোখ লাল থাকে। তূর্ণা ঘুমিয়েছে বুঝলেই বাবা বিছানা ছেড়ে বারান্দায় যায়। চুপচাপ বসে থেকে পুরো রাত পার করে দেয়। তূর্ণা নয় বছরের ছোট্ট মেয়ে হলেও অনেক কিছু বোঝে। পরিস্থিতি তাকে বুঝিয়ে দেয়।

রাত নামে। অল্পবয়সী রাত। সন্ধ্যের শরীর ফুঁড়ে বের হওয়া সদ্য জন্ম নেওয়া রাত। মার চিৎকার শোনা যায়। ভয়ানক চিৎকার। তূর্ণা ভয়ে যায় না। আজকের ঝগড়াটা অন্য রকম। তূর্ণার ভয় তাই আরো বাড়ে। মায়ের চিৎকার বাড়তেই থাকে। আশপাশের বাড়িগুলো থেকে লোকজন আসতে থাকে। মা দরজা খোলে। ঘরের আলো জ্বালানো হয়। এবার বারান্দা থেকেই সব চোখে পড়ে তূর্ণার। তূর্ণা মায়ের ভয়ে বারান্দা থেকে বের হয় না। সে দেখতে পায় বাবাকে ধরাধরি করে লোকজন নিয়ে যাচ্ছে। তূর্ণার বুকটা কেঁপে ওঠে। বাবার জন মন জানি কেমন করে ওঠে। বাবার হাত থেকে রক্ত ঝড়ছে অনবরত। তার জ্ঞান নেই। কি হয়েছে বাবার?

বাবা কি হেরে গেল? কথা তো দিয়েছিল তূর্ণাকে ছেড়ে যাবে না কোথাও কোনোদিন। মায়ের সাথে অনেক অনেক ঝগড়া হলেও ভেঙে পড়বে না। লক্ষ্মী তূর্ণাকে কোলে নিয়ে ঘুম পাড়াতে পাড়াতে এসব কথা বলতো পৃথিবীর সেরা বাবা। সব মিথ্যে হয়ে যায়। এমনটাই নিয়ম। তূর্ণার মতন ছোট বাচ্চাটাও এসব বোঝে।

বাইরে রাত বাড়ছে কিনা কে জানে। সবাই বাবাকে নিয়ে ব্যস্ত। চিৎকার চেঁচামেচি চারপাশে। গোলমাল। এসবের ভেতর তূর্ণার দিকে খেয়াল নেই কারো। ভিড়ের ভেতর পায়ে ব্যথা নিয়ে হাটি হাটি পা পা করে সে বাবার ঘরে

যায়। দেখতে পায় মেঝে ভেসে যাচ্ছে রক্তে। তার মন ভালো হয়ে যায়। খুব ভালো হয়ে যায়। সে রক্ত দিয়ে লেখা শুরু করে ‘ব’ এ আকার ‘বা’ আবার ‘ব’ এ আকার ‘বা’। ‘বাবা’। বাবা কখন আসবে? এবারও ভুল হয়নি বানান। খুশি হয়ে যাবে বাবা। এসে দেখুক না প্লিজ। প্লিজ। তূর্ণা মামনি এখন আর বানান ভুল করে না। একদমই না।

পত্রকথন

প্রিয় দেবযানী,

স্বপ্ন দেখেছিলাম কোনো এক সোনালি রোদে কীর্ত্তনখোলা নদীর তীরে বসে আছি আমি। আমার দুষ্ট পুতুলের মতো মেয়েটার পেছনে ছোটাছুটি করে অবশেষে তুই ক্লান্ত। রুক্ষ,অগোছালো চুলে বিলি কেটে দিতে দিতে বললি, 'ভালোবাসি তোমায়। বড় বেশি ভালবাসি'। আগাগোড়া নিষ্ঠুর একটা মানুষ হয়েও সেদিন আমি অনেক কাঁদলাম। অনেক। জানিস সাহস করে স্বপ্নটার কথা বলা হয়নি এতদিন। মিছে বলিস না তুই। আমি আসলেই একটা ভীতুর ডিম। ভেবেছিলাম কোনো এক চাঁদ ওঠা মাঝরাত্তিরে স্বপ্নের ডালি নিয়ে বসবো তোর পাশে। হলো না। কিচ্ছু হলো না।

পহেলা ফাল্গুনে ডুরে পাড়ের হলদে শাড়ি পরে এসেছিলি। কপালের ওই রক্তাভ টিপটা জ্বলছিল সূর্যের মতন জ্বলজ্বল করে। আড়চোখে সারাটাক্ষণ দেখলাম তোকে। ভুলে নিশ্চয়ই গেছিস সব। মনে পড়ে, দুর্গাসাগরে গিয়ে কৃষ্ণচূড়াটার তলে বসে কি পাগলামিটাই না করেছিলি। হাত কেটে নিজের রক্ত মাখালি কৃষ্ণচূড়া ফুলে। তারপর ভাসিয়ে দিলি দীঘির শান্ত- নিথর জলে। বলেছিলি ঐ ফুল এক ফুটফুটে মেয়ে হয়ে ফিরে আসবে তোর গর্ভে। হা হা, পাগলি কোথাকার!
আমার হাসি দেখে গাল ফুলিয়ে তোর সে'কি রাগ। সেদিন আমরা নিয়েছিলাম প্রথম চুম্বনের স্বাদ। ঠোঁটে ঠোঁটে, হৃদয়ে হৃদয়ে, কৃষ্ণচূড়ার পাতাকে আড়াল করে। তারপর কথা দিলি আমারই রবি, মনের মিষ্টি খামটার ভেতর বন্দি হয়ে স্বাধীন চিঠিটির মতো সারাটা জীবন। কথা দিয়েছিলি করবি অপেক্ষা পলাশপুরের সামনে। রজনীগন্ধার তোড়া নিয়ে হাতে। সেই তোড়ার ফাঁক দিয়ে উঁকি দেবে ভালোবাসার আটটি লাল গোলাপ। পরনে থাকবে তোর জ্বলজ্যান্ত- পহেলা ফাল্গুন। হলুদ হয়ে, ফুলে ফুলে, বসন্তের গানে। মাঝরাতে জাগিয়ে জোর করে কবিতা আবৃত্তি করে শোনাব। তোর সেই প্রিয় কবিতাটা- 'সারাদিন মিছে কেটে গেলো/সারারাত বড্ড খারাপ/নিরাশায়, ব্যর্থতায় কাটবে জীবন/দিনরাত দিনগত পাপ।' আরও বলেছিলি সারারাত জেগে ঘুমাবো সকালের দিকে। ভেজা রাতকে দুপুরের মিঠে রোদে শুকোতে দিয়ে নিশ্চুপ হয়ে পাশাপাশি বসে থাকবো অনেকটাক্ষণ। পার হবে সারা দুপুর, বিকেল, সন্ধ্যে, সারাটা রাত। পুরোটা সময় দেখব আকাশের ক্ষণে ক্ষণে মন বদলানো। কেন জানি না হলো না কিছুই। হয়তো হবেও না। মুখ থুবড়ে পড়বে আমার ডানা মেলা স্বপ্নগুলো।

আজ রাত কাটে নির্ঘুম। ঘুম ঘুম চোখও আসে না ঘুম হয়ে। সারাটাক্ষণ একটা আবছায়া সাদাকালো ছবি ভাসে মনের আকাশটায় মেঘ হয়ে। পড়ায় মন বসে না। ক্লাসগুলো ফাঁকি দিয়ে হেঁটে বেড়াই কালীবাড়ি রোড ধরে।

উদ্দেশ্যহীনভাবে। বসে থাকি ধোঁয়াশার মতন আপনাতে আচ্ছন্ন হয়ে। রাত যখন নীরবতার পর্দা টানায় চারিপাশে তখন লিখতে বসি। একের পর এক চিঠি। অফসেট পেপারের সাদা বুকে যত্ন করে, প্যাঁচানো অক্ষরে, লাল, নীল আর কালো কলমের কালিতে। দেখতে দেখতে জমে যায় চিঠির স্তূপ। আটটা থেকে আশি আবার আশি থেকে আটশত আশিটায়। রাতটা বুড়ো হয়। খোলা ছাদে এসে দাঁড়াই আমি। আকাশের বুকে অগুনিত তারার ফুল হাতছানি দিয়ে ডাকে। আমি ছুতে চেষ্টা করতেই ছায়াপথ পেরিয়ে দূরে চলে যায় ওরা। সবার অগোচরে কালো জমিনে আঁকে ছবি।

আমি চলে যাচ্ছি। প্রায় তারাদের দেশের কাছাকাছি। বাবার আদেশ বিদেশে পড়তে হবে। কঠিন আদেশ। তাইতো চলে আসলাম শেক্সপিয়রের শহর অ্যাভনে। ইচ্ছে হলে তুইও আসতে পারিস। জানিস আমার বাড়ির সামনের পথটা বড্ড ধূসর। ছোট ছোট অজানা ধূসর রঙা ফুল ঝরে গিয়ে পথকে পরিয়ে দেয় রঙিন কোর্তা। এগুলো কিছুটা বকুলের মতো দেখতে। মন খারাপ করা ফুল। আচ্ছা তোদের ওখানে কি বকুল ফোটে? মন খারাপ হলে এখনও কি শুনিস ঝরা বকুলের কান্না? খুব জানতে ইচ্ছে হয়। জানাস কিন্তু।

ইতি-
তোর ভীতুর ডিম

কচুরীপানায় জীবন

জেসমিনকে ভালোবাসতে ইচ্ছে করে।

আকাশের অবস্থা ভালো আজ। পরিষ্কার, ফকফকা কিছু মেঘ আকাশ দখল করে আছে। মেঘেদের পাশ ঘেঁষে একদিকে দাঁড়িয়ে আছে সূর্যটা। মিষ্টি রোদ। সন্ধ্যে হয়েছে অনেকক্ষণ কিন্তু আবহাওয়া ভালো দেখে শেষ বিকেলের আলোর রেশ এখনও কাটেনি। বড় ভালো লাগা চারপাশে।

এতসব ভালোলাগার মাঝেও তোজাম্মেলের মন ভালো নেই। সদরঘাটে যাত্রীদের ভিড় কম। লোকজনের আনোগোনা কমে গেলে ব্যবসা ভালো হয় না। উপোসে উপোসে কাটে দিন। উপোসে থাকা দিনগুলো বড় যন্ত্রণার। শরীরের তাকত কমে যায়। তোজাম্মেল জোয়ান মরদ। শরীরের জোর কমে গেলে আর থাকেটাই কি!

পকেটে পাঁচটা টাকা আছে। দোকান থেকে একটা বিড়ি কিনে ধরায় তোজাম্মেল। তবে বিড়ি টানতে ভালো লাগে না। সকাল থেকে কিছুই মুখে দেওয়া হয়নি। খালি পেটে ধোঁয়া গিয়ে ভেতরের সবকিছু তেতো করে দিচ্ছে। গা গুলায়। একটা ফলের দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে সে দলের অন্য সবার জন্য অপেক্ষা করতে থাকে। লঞ্চ ছাড়বে এখনই। সর্দারের কথামতন সবার এতক্ষণে লঞ্চে উঠে যাবার কথা। কিন্তু দলের কাউকেই সে আশপাশে দেখতে পায় না। মেজাজ খারাপ হয়। পিচিক করে একদলা থুতু ফেলে সে লঞ্চে উঠে যায়। দলের লোকজনদের জন্য এখানে অপেক্ষা করে লাভ নেই। তারা হয়তো সব লঞ্চে উঠে বসে আছে। তোজাম্মেলই মনে হয় খুঁজে পাচ্ছে না কাউকে।

লঞ্চে উঠে ইঞ্জিনের একপাশে গিয়ে বসে তোজাম্মেল। পাশেই চায়ের দোকান। লঞ্চ এখনও ছাড়েনি। ছাড়লে ইঞ্জিনের শব্দে কানে তালা লাগার জোগাড় হবে। তখন আর এদিকে বসা যাবে না। ইতিউতি তাকিয়ে দলের লোকজনদের খুঁজতে থাকে সে। একজনকে পেয়েও যায়। কাজ ঠিকমতনই চলছে বুঝতে পারে তোজাম্মেল।

ভিড় বাড়ছে। দেখতে দেখতে মানুষে ভর্তি হয়ে যায় লঞ্চের ডেক। বাংলা ছবি চলছে ডেকের টিভিতে। মনোযোগ দিয়ে দেখছে সবাই। কিছু যুবক ছেলে ব্যস্ত তাস খেলায়। তোজাম্মেল ঘুরে ঘুরে সব দেখতে থাকে। ডেকের এক কোনায় ইঞ্জিনের ঠিক কাছেই তাড়াতাড়ি করে খেতে বসেছে এক পরিবার। টিফিন ক্যারিয়ারে করে নিয়ে এসেছে খাবার। কাচকি মাছ দিয়ে রান্না করা হয়েছে টমেটো। মুরগির ঝোলে ডুবে থাকা আলু দেখে ক্ষিধেটা বাড়ে খুব।

মেজাজ খারাপ করে ডেক ছেড়ে কেবিনের দিকে উঠে যায় সে। তাদের বেশিরভাগ লোক এদিকেই আছে। সর্দারের হুকুম ডেকে কাজ করা যাবে না। ডেকের লোক গরিব। কাজে পরিশ্রম ঠিক ঠিক হলেও ফয়দা নাই।

আড়চোখে কয়েকজন আনসার সদস্যকে দেখে নেয় তোজাম্মেল। এদের অনেককেই হাত করে রেখেছে সর্দার। মাস শেষে একটা টাকা চলে যায় লোকগুলোর হাতে। কষ্ট না করেই পয়সা কামানো আর কি! আজকে কারা কারা পয়সা খেয়েছে জানে না সে। তাই একটু সাবধানেই থাকা হয়।

কেবিনে সব বড়লোক মানুষ। তাদের বড়লোকী খানাদানা, বড়লোকী কারবার। প্রতি কেবিনে টিভি আছে। আছে এসি। তাদের টিভিতে বাংলা ছবি চলে না। চলে হিন্দি কিংবা ইংলিশ ছবির গান। এই লোকগুলো দেখতেও সুন্দর, পরিপাটি। গায়ের রংও পরিষ্কারের দিকে।

‘এক্সকিউজ মি, একটু সরে দাঁড়াবেন। কেবিনে ঢুকবো।’ চব্বিশ কি পঁচিশ বছর বয়সী এক অদ্ভূত সুন্দর মেয়ে কথাটা বলে।

কথা শুনে তোজাম্মেল সরে গিয়ে জায়গা করে দেয়। মেয়েটা কেবিনে ঢোকে। দেখেই বোঝা যায় সদ্য বিয়ে করেছে। হাতে লাগানো মেহেদি চোখে পড়ে। তার বর আসে একটু পর। হাতে ডজন খানেক কলা আর এক প্যাকেট পাউরুটি। মেয়েটার সাথে কথা বলে কিছুক্ষণ বরটা। কান পেতে কথা শোনে তোজাম্মেল। কথা ছেঁকে জানতে পারে মেয়েটার নাম জেসমিন। আহা, কি সুন্দর নাম। নাম শুনেই ভালো লেগে যায় জেসমিনকে। ভালোবাসতে ইচ্ছে করে।

পরিষ্কার আকাশ হঠ্যাৎ মেঘে ঢেকে যায়। সাদা আকাশ ঢাকা পড়ে কালো চাদরে। টিপটিপ করে বৃষ্টি পড়তে শুরু করে। লোকজন তাড়াহুড়ো করে উঠে পড়ে লঞ্চে। অল্প কিছু মানুষের ভিড় থেকে কেউ একজন বলে ‘রেডিওতে কইছে তিন নাম্বার সিগন্যাল। রাইতের দিকে তুফান হইবো খুব।’ কথা শুনে যাত্রীরা ভয় পায়। কেউ কেউ নেমে যাবে কিনা, লঞ্চের ইঞ্জিন ঠিক আছে কিনা, যে লঞ্চ চালাবে তার লাইসেন্স আছে কিনা এসব নিয়ে কথা বলে। তোজাম্মেল সিগন্যাল নিয়ে মাথা ঘামায় না। সে নদীর মানুষ। এই নদীই তার রিযিকের ব্যবস্থা করে। যে নদীর সাথে তার এত আপন সম্পর্ক সেই নদীকে ঝড়-তুফানের দিনে ভয় পেলে চলে না।

লঞ্চ ছাড়ে। তোজাম্মেল ডেকের দিকে যায়। ডেকে লোকজন নেই বললেই চলে। বৃষ্টির কারণে অনেকেই উপরে উঠে এসেছে। কেবিনের সামনের জায়গায় বিছানার চাদর, গামছা বিছিয়ে বসে পড়েছে লোকজন। দলের সবাই উঠেছে। সব মিলিয়ে পনের জন। পরপর তিন দিনের ছুটি ছিল। সরকারি ছুটি। সর্দার ভেবেছিল অনেক লোক ঢাকা ছাড়বে। কিন্তু ভুল। লোকজন খুবই কম। এই অল্প কিছু লোকের জন্য পনের জনের দরকার ছিল না। এত জন আসার কারণে এখন ভাগ বাটোয়ারা নিয়েও ঝামেলা হবে। ভাগে কম পড়লেই মেজাজ খারাপ হবে সবার। ডেকে এসে জেসমিনের বরকে দেখতে পায় তোজাম্মেল। এক লোকের সাথে কথা বলতে বলতে সিগারেট আর চা খাচ্ছে। বন্ধু হবে হয়তোবা। মন খারাপ করে উপরে উঠে আসে তোজাম্মেল। বিড়ি খেতে ইচ্ছে করে। পকেটে পয়সা নেই। ক্ষিধে কতক্ষণ আর সহ্য করতে হবে জানা নেই। অসহায় লাগে খুব।

জেসমিনের কেবিনের সামনে গামছা পেতে বসে তোজাম্মেল। নদীতে স্রোত খুব। লঞ্চের ইঞ্জিনের জোর কম। পাল্লা দিয়ে পারছে না। বৃষ্টির বেগ বাড়ছে। এখন বাইরে অন্ধকার। আকাশে একটি তারাও নেই। গাঢ় অন্ধকার পৃথিবীতে এই লঞ্চটিতেই যেন শুধু আলো আছে।

যাত্রীরা কথা বলছে। কেউ কেউ এরই মাঝে ঘুমিয়ে পড়েছে। বড় বড় ঢেউ আছড়ে পড়ছে লঞ্চের গায়ে। যারা নিয়মিত লঞ্চে যাতায়াত করে তারা এসব দেখে আতঙ্কিত হয় না। এমন হরহামেশাই হয়।

‘চানাচুর খাবেন?’ বলে জেসমিন।

কথা শুনে শরীরটা কেঁপে ওঠে তোজাম্মেলের। কেমন যেন শান্তি শান্তি লাগে। নেশার মতন। বড়লোক মেয়েদের সবই সুন্দর। কি সুন্দর গায়ের রং। ধবধবে সাদা। পায়ে নূপুর। একটা লোমও নেই শরীরের কোথাও। সুন্দর। অদ্ভুত সুন্দর।

এই সুন্দর মেয়ে জেসমিন কিছু খাওয়ার জন্য বলছে আর তোজাম্মেল সেটা শুনবে না এমন হতেই পারে না। হাত বাড়িয়ে চানাচুর নেয় তোজাম্মেল। সারাদিন পর এই একটুখানি খাওয়া। দারুণ স্বাদ চানাচুরের। খাওয়ার পর ক্ষিধেটা বেড়ে যায় আরো। বড়লোক মেয়েরা এমন হয় না। অপরিচিত এক মানুষের জন্য এমন উদার হবার কারণ কি! মেয়ের কি মাথা খারাপ? জেসমিনের জন্য মন থেকে দোয়া করতে ইচ্ছে করে।

‘পুরো প্যাকেটটাই নিন। আমি এত খেতে পারি না। বারবি-কিউ চানাচুর। টেস্ট ভালো।’ চানাচুরের পুরো প্যাকেটটা তোজাম্মেলের হাতে দেয় জেসমিন। তোজাম্মেল না করে না। খেতে থাকে চানাচুর।

‘নতুন বিয়া করছেন?’ খেতে খেতে বলে তোজাম্মেল। এমন সময় বাজ পড়ে। জেসমিন ভয়ে কেঁপে ওঠে। তোজাম্মেলের ভালো লাগে এই ভয় পাওয়া দেখতে।

‘আকাশের অবস্থা তো খুবই খারাপ।’

‘ভয় নাই। এই লাইনের লঞ্চ কহনও ডুবে না।’

‘চাইলে একটু ভেতরে এসে বসতে পারেন। বৃষ্টি ছাটে ভিজে যাচ্ছেন তো।’ তোজাম্মেলকে ভিজতে দেখে বলে জেসমিন।

‘না না ঠিক আছি। বৃষ্টিতে ভিজলে কিছু হবো না। বাইরেই ঠিক আছি।’ ভেতরে আসবে না বললেও তোজাম্মেল কেবিনের ভেতর গিয়ে বিছানায় বসে। জেসমিন এবার বিব্রত বোধ করে। সে তোজাম্মেলকে দরজার কাছ ঘেঁষে বসতে বলেছিল। তোজাম্মেল কেবিনের ভেতরে এসে বিছানায় বসে পড়বে সেটা সে কখনও ভাবেনি। এখন তার বর চলে এলে বিপদ। অপরিচিত লোকের সাথে কথা বলা এবং কেবিনের ভেতর নিয়ে আসার জন্য ধমক দেবে নিশ্চিত।

‘আপনের জামাইরে দেখলাম নিচে দাঁড়াইয়া আছে।’ একটু আরাম করে বসে চারপাশটা দেখতে দেখতে দেখতে বলে তোজাম্মেল। বড় একটা স্যুটকেস আছে খাটের নিচে। নতুন বিয়ে হলে ভেতরে সোনাদানা থাকার সম্ভাবনাটা উড়িয়ে দেওয়া যায় না।

‘জ্বি। ওর বন্ধুও উঠেছে এই লঞ্চে। তার সাথে আড্ডা দিচ্ছে।’

‘ঝড় তুফানের মইদ্যে বউ রাইখা বন্ধুর লগে আড্ডা দেওন তো ভালো না।’ বলে তোজাম্মেল। কথা শুনে জেসমিনের যেন একটু মন খারাপ হয়।

‘আমার বরের কাছে বউয়ের চেয়ে বন্ধু বড়। আপনি যান এখন। বৃষ্টি নেই আর। আমি দরজা বন্ধ করে একটু রেস্ট নেব।’ রেগে কথাটা বলে জেসমিন।

তোজাম্মেল কেবিন থেকে বের হয়ে বাইরে এসে বসে। জেসমিন দরজা আটকে দেয়। জানালার পর্দা ওঠানোই থাকে। টিভিতে চলতে থাকে বাংলা নাটক। বাইরে বসে সব খেয়াল করে তোজাম্মেল। বৃষ্টি নেই এখন আর। ঠাণ্ডা বাতাস বইছে। ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা লাগে তোজাম্মেলের। সে তার দলের লোকজনদের দেখতে পায়। কেবিনগুলো ঘুরে ঘুরে দেখছে সবাই। লঞ্চ চাঁদপুর পৌঁছে যাবে কিছুক্ষণ পর। তারপরই শুরু হবে আসল কাজ।

রাত বাড়ে। জেসমিনের কেবিনে আসে বর। রাতের খাবার খায় তারা একসাথে। ডাল চচ্চরি, তেলাপিয়া মাছ আর গরুর মাংস দিয়ে ভাত খাবার সময় একবারও তোজাম্মেলের কথা ভাবে না জেসমিন। বর আসার পর সে এমন ভাব করে যেন চেনেই না তোজাম্মেলকে। বরের সাথে ঘনিষ্ঠ হয়। চুলে বিলি কেটে দেয়।

এসব দেখে রাগ হয় তোজাম্মেলের। সে গরিব হতে পারে কিন্তু তার এই তরতাজা ভালোবাসা তো গরিব না। একসময় কেবিনের আলো বন্ধ করে শুয়ে পড়ে জেসমিন আর তার বর। জানালা খোলাই থাকে। লঞ্চে কেবিনের জানালা নিয়ে মাথা ঘামায় না কেউ। আজ শীত পড়েছে। জানালা বন্ধ রাখাই স্বাভাবিক ছিল। কি কারণে জেসমিন এমন করে বোঝা যায় না। আনসাররা এসে দরজা, জানালা বন্ধ করে ঘুমাতে বলে সবাইকে। বলে চোর, ডাকাত থেকে সাবধান থাকতে। কিছু খোয়া গেলে কর্তৃপক্ষ দায়ী নয় এটাও জানিয়ে দেয়। আনসারদের কথা সবাই শোনে না। জেসমিনও এমন একজন।

দলের এক লোকের কাছ থেকে রাতের খাওয়ার টাকা নেয় তোজাম্মেল। ডেকে গিয়ে ভাত আর আলু ভর্তা খেয়ে নেয়। একটু পরেই কাজ শুরু হবে। মাথার ভেতর থেকে জেসমিনকে সরিয়ে দেয় তোজাম্মেল। কাজের সময় পুরুষ মানুষের ভালোবাসা নিয়ে ভাবলে চলে না। অনেক পরিশ্রম হবে আজ রাতে। খাওয়ার পর শরীরে তাকত

ফিরে আসে যেন। পুরো লঞ্চটা আরেকবার চক্কর দেয় তোজাম্মেল। আনসাররা জানায় চাঁদপুর পৌঁছালেই তারা কাজ শুরু করতে পারবে। কেউ বাধা দেবে না। তাদের দাবি শুধু বখরা যেন ঠিকমতন পৌঁছে দেওয়া হয়।

কেবিনের সব লোক ঘুমে। বাতি নেভানো। তোজাম্মেল জেসমিনের কেবিনের সামনে এসে দাঁড়ায়। আকাশ অন্ধকার। বৃষ্টি পালালেও বাতাসের জোর প্রবল। উথাল পাথাল ভাবনা এসে ভিড় করে তোজাম্মেলের মাথায়। সেই ছোটবেলা থেকে শুধু ছুটেই যাচ্ছে সে। বাবা-মা হারিয়ে ঠাঁই নিয়েছিল সদরঘাটে। কুলিগিরি, পকেটমারি, চুরি করে কেটেছে এতগুলো বছর। মাঝখানে কিছুদিন অফিসে পিওন হিসেবেও কাজ করেছিল। মনে বসেনি। তার রক্ত গরম। এসব সাদাসিধে কাজ পোষায় না। তাইতো নতুন এই কাজ বেছে নেওয়া। তবে এই কাজেও মন বসে না। আজকাল থিতু হওয়ার কথা ভাবে তোজাম্মেল। ভাবে একটা প্রেমিকা, একট বউয়ের কথা। বউয়ের নরম শরীরের গন্ধ নিতে নিতে হেলেঞ্চা শাক আর ডাল দিয়ে ভাত খাবার স্বপ্ন দেখে সে। একটা আশ্রয় হলে মন্দ হয় না। তোজাম্মেলের জেসমিনের মতন একটা বউয়ের শখ হয়। সাদা গায়ের রং, লোমহীন শরীর, টানা টানা চোখ, ঢং করে কথা বলা, মারবেলের মতন নাভিওয়ালা এক মেয়েকে বউ হিসেবে পেলেই জীবন সার্থক।

চাঁদপুর লঞ্চ এসে পৌঁছে। তৈরি হয় দলের সব লোক। বরিশালে যাওয়ার পথে এখানে এসে থামে লঞ্চ। চাঁদপুর থেকে যারা বরিশাল যাবে তারা ওঠে লঞ্চে। ফেরিওয়ালারাও উঠে পড়ে বিক্রি বাট্টার আশায়। কিছুক্ষণ থেমেই লঞ্চ আবার চলতে শুরু করে। আবার বাতি নিভে যায়। কেবিনে জেগে ওঠা লোকজন ঘুমিয়ে পড়ে। সব চুপচাপ। নীরব।

মিনিট পনের লঞ্চ চলে। পাড় হতে একটু দূরে আসতেই দলের একজন জানায় নৌকা তৈরি আছে। কাজ শুরু হয়ে যায়। সাবধানে খোলা জানালা দিয়ে হাত ঢুকিয়ে জেসমিনের কেবিনের দরজা খোলে তোজাম্মেল। কেউ কিছু টের পায় না। আবছায়া অন্ধকারে জেসমিনের এলোমেলো কাপড় চোখে পড়ে। বরটা তার লোমশ এক পা উঠিয়ে দিয়েছে জেসমিনের ওপর। জেসমিনের ঘুমন্ত মুখটা দেখে বড় মায়া মায়া লাগে। একটু ছুঁয়ে দিতে ইচ্ছে করে। জেসমিনের ওপর থেকে চোখ ফিরিয়ে নিয়ে তোজাম্মেল কাজে মন দেয়। ধীরে ধীরে শব্দ না করেই বের করে নিয়ে আসে স্যুটকেসটা। ভালো ওজন!

অল্প সময়ের ভেতর স্যুটকেস নিয়ে কেবিনের বাইরে আসতেই চোখে পড়ে দলের লোকজনদের। সবার হাতে চুরি করা ব্যাগ। দূরে নৌকা দাঁড়িয়ে। নৌকা ভেতর জ্বলতে থাকা কুপির আলো দেখে লঞ্চ থেকে নৌকার দূরত্ব ঠাওর করা যায়। নৌকা দেখেই ব্যাগ নিয়ে দলের এক একজন লাফিয়ে পড়ে নদীতে। তোজাম্মেলও লাফ দেয়। তাদের পানিতে পড়ার আওয়াজ শুনে একজন-দুজন করে প্রায় সবাই জেগে ওঠে লঞ্চের। কেবিনে কেবিনে জ্বলে ওঠে বাতি। আনসাররা লোক দেখানো হম্বিতম্বি করে। চিৎকার করে যাত্রীরা। লঞ্চ দাঁড়ায় না। একটু একটু করে দূরে চলে যায়।

তোজাম্মেল সাতরায়। পানি খুব ঠাণ্ডা। এত বড় স্যুটকেস নিয়ে সাঁতরাতে কষ্ট হয়। একটু দূরেই নৌকা। বড় করে নিঃশ্বাস নেয় তোজাম্মেল। স্রোত খুব। অন্য দিকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে। দলের প্রায় সবাই ব্যাগ নিয়ে উঠে পড়েছে নৌকায়। সাঁতরানোর সময় তোজাম্মেল একবার পেছন ফিরে তাকায়। দূর থেকেও লঞ্চের রেলিং ধরে দাঁড়ানো জেসমিনকে চোখে পড়ে। কেন জানি তোজাম্মেলের মনে হয় জেসমিনের চোখে রাজ্যির অবিশ্বাস। ভালোবাসার মানুষের সাথে এমন করতে নেই। এমন কি করতে হয়?

কিছু কচুরীপানা ভেসে যায় তার পাশ দিয়ে। কচুরীপানা দেখে তোজাম্মেল ঠিক করে এমন করে ভেসে ভেসে আর অজানার উদ্দেশে যাওয়া নয়। সে থিতু হবে। তার থিতু হওয়া দরকার। কচুরীপানার জীবন বড় কষ্টের। সাঁতার দেবার সময় পানির ওপর মাথা তুলে চোখ দিয়ে লঞ্চ পর্যন্ত দূরত্বটা মেপে নেয় তোজাম্মেল। তারপর সাতরায় লঞ্চ তাক করে। এদিকে স্রোত অনুকূলে আছে। খুব বেশি সময় লাগবে না দূরত্বটুকুন পার হতে। যত যাই হোক

জেসমিনের কাছে ফিরতে হবে। তার হাতে তুলে দিতে হবে স্যুটকেসটা। বলতে হবে, যারা ভালোবাসে তারা খারাপ নয়। সাচ্চা ভালোবাসায় কোন ভেজাল নেই।

তোজাম্মেলকে উল্টো দিকে সাতরাতে দেখে চিৎকার করতে থাকে দলের লোকজন। 'অই কনে যাস? তোজা ও তোজা যাস কই? মইরবি তো...।' বলে সবাই। তোজাম্মেল কথায় কান দেয় না। মরবে জানে সে। তবে কচুরীপানার জীবনের চেয়ে মরে যাওয়া ভালো। ভালোবাসার জন্য মরে গিয়েও সুখ। তোজামেল স্যুটকেসটা নিয়ে সাঁতরায়। প্রাণপণে সাঁতরায়। লঞ্চ তাক করে সাঁতরায়। আজ জেসমিনকে ভালোবাসার দিন। আজ থিতু হওয়ার দিন।

শতদলী মকবরা

বিকেলের শেষ দিকে মেয়েটাকে মারবে বলে ঠিক করে ময়নুল।

বাউফল থেকে আড়াই কিলোমিটার ভেতর গেলেই কালাইয়া লঞ্চঘাট। এরপর ট্রলারে করে যেতে হবে চর ওয়াডেল খেয়াঘাট। খেয়াঘাট থেকে হাটা শুরু করলেই মিনিট ত্রিশেক পর পৌঁছে যাওয়া যাবে চর মিয়াজানে। তেঁতুলিয়ার বুকে জেগে ওঠা এ ছোট্ট চরে লোকসংখ্যা হাজার দুয়েক। চরের বেশিরভাগ লোকই মাছ ধরে জীবিকা নির্বাহ করে। একটা টিনের ঘরও নেই এখানে। নেই কোনো ধনী মানুষ।

বড্ড বেশি সবুজ এ গ্রাম। এত সবুজ যে চোখে ধাঁধা লাগে। চরের একপাশ কাশফুলে ঘেরা। কাশফুলের শেষ সীমানা মিলেছে গিয়ে নীল আকাশের সাথে। এখানকার আকাশটা ভয়ঙ্কর নীল। ময়ূরকণ্ঠী নীল আকাশ। সবুজ, সাদা আর নীলের মাখামাখি এই চরে। মানুষগুলোর গায়ের রং অবশ্য কালো। অনেক কষ্টেও গায়ের রং পরিষ্কার, ফর্সা এমন কাউকে খুঁজে পাওয়া যায় না। পাওয়া যাবেই বা কেন?

ছোটলোক, গরিবদের গায়ের রং কালোই হয়। এমন নিয়মই হাজার বছর ধরে চলে আসছে। গ্রামের ময়নুলের ক্ষেত্রেও এর ব্যতিক্রম হয় না। ময়নুল কালো। কয়লার মতন কালো। চেহারা দেখেই বলে দেওয়া যে সে ছোটলোক। গায়ে মাংস বলতে কিছুই নেই। শরীরভর্তি ধূলো। ছেড়া লুঙ্গি তার পড়নে। কোনোরকমে লজ্জা ঢাকা পড়ে এতে। টাকা জমানোর মতন বিলাসিতা এই চরের মানুষদের নেই। ময়নুলের ছিল। টাকা জমিয়ে একটা গরুও কিনে ফেলেছিল। বাড়ির সামনে করেছিল সবজির বাগান। লাভ হয়নি। গরুটার রোগ লেগেই ছিল। প্রথমে খুরা রোগ। একবার রোগ ধরলে আর থামতেই চায় না। চামড়ায় কি জানি হলো এরপর। গরুটা কোনো কিছু হজম করতে পারত না। খুব বেশিদিন বাঁচেনি। ময়নুলকে পথে বসিয়ে, আরো গরিব করে মারা গেছে অল্প দিনের ভেতরেই। সবজিও নষ্ট হয়েছে। গরিবের সচ্ছল হওয়ার স্বপ্ন দেখতে নেই। দুটো পয়সা বেশি আয় করবার বাসনা থাকতে নেই। এসব পাপ।

ময়নুল বুঝে গিয়েছে। জীবনটা এতদূর টেনে এনে বুঝতে পেরেছে উপোস থেকেই তাকে জীবন পার করতে হবে। তাই-ই সে করছে। হাল ছেড়ে দিয়েছে। মাছ ধরা বন্ধ। হাতে কোনো কাজ নেই। বছরের একটা সময় দিনমজুরি করা হয়। এ বছর সে সুযোগটাও নেই। বাউফলে রাস্তার কাজ হচ্ছে। মাটির রাস্তা পাকা করছে সরকার। সেই সুবাদে কাজ পাওয়া যাচ্ছে। ময়নুল একবার ভেবেছিল যাবে। কিন্তু শরীরের যে অবস্থা তাতে যাওয়ার সাহস হয় না।

কাশিটা বেড়েছে। গলায় কফ জমে থাকে। রাতে ঘুম হয় না। সারারাত কাশতে কাশতে যায়। প্রায়ই জ্বর আসে। শরীর কাঁপে। প্রসাবের বেগ হয় খুব। আজকাল আর আটকে রাখা যায় না। কয়েকদিন আগে বিছানা ভিজিয়ে বউয়ের গালি খেয়েছে সে।

সে আর মরদ নেই। ত্যানানো মুড়ির মতন হয়ে গিয়েছে। আয়-রোজগার যেই পুরুষের নেই সে আর পুরুষ থাকে না। হিজড়া হয়ে যায়। ময়নুলের সাথে রাগ করে তার বউ আর শরীর দেয় না। তাছাড়া পেটের ক্ষুধা এত তীব্র থাকে যে শরীরের ক্ষুধার কথা ভাবার সময়ই হয় না আজকাল। বউটা চলে যাবে। ময়নুলের সন্দেহ। ভাত জোগাতে না পারলে বউ অন্য পুরুষের কাছে যাবেই যাবে। বউ চলে গেলে ময়নুল মুখ দেখাতে পারবে না। গলায় দড়ি দিতে হবে।

ময়নুলের জীবনের সবকিছু হল পারুল। তার মেয়ে। পারুল তার কলিজার টুকরো। মাগো, মাগো বলে পারুলকে বুকে জড়িয়ে ধরলে সে ক্ষিধের কথা ভুলে যায়। কেন জানি তার চোখে জল আসে। মন নরম হয়। মনে হয় এই পৃথিবী বেঁচে থাকার জন্য খারাপ না। খুব বাঁচতে ইচ্ছে করে। তখন খুব বাঁচতে ইচ্ছে করে।

ময়নুলের মেয়েটা তার মতনই। ক্ষিধের বদ অভ্যাস আছে। খালি ক্ষিধে পায়। খাওয়ার জন্য চিৎকার করে। উপোস থাকলে কাঁদে। মায়ের ঝাটার বাড়ি খেয়েও থামে না। কান্না বাড়ে তাতে। কাঁদতে কাঁদতে বমি হয় একসময়। এই মেয়েরও শরীরে রোগের শেষ নাই। পাকস্থলীতে সমস্যা আছে। পেটে ভাত না থাকলে সমস্যা হওয়াটা অস্বাভাবিক না।

পেটে ভাত কিন্তু আছে পারুলের। খাওয়া হলে অই ভাতই খাওয়া হয় যা একটু। আর কিছু পাওয়ার জো নেই। তরকারি খাওয়া হয় না অনেক দিন। মাছ-মাংস স্বপ্নেও আসে না আজকাল। পারুল তাই ভাত দিয়ে ভাত খায়। ভাত খেয়ে বেঁচে থাকে।

মেয়ের বয়স কম। মেয়ে তাই স্বপ্নে ভালো-মন্দ খাওয়ার স্বপ্ন দেখে। স্বপ্ন দেখে এটা ওটার আবদার করে। তার মা গালি দেয়। মারে। ময়নুল মারতে পারে না। মেয়ের জন্য মায়া হয়। শরীরে নাই কিছু। এই শরীরে মার সহ্য হয় না। মার খেলেই জ্বর আসে। আকাশ-পাতাল জ্বর।

পারুল শিরনি খাওয়ার বায়না ধরে। আজকের বায়না না। অনেকদিন আগের বায়না। তার শিরনি খেতে ইচ্ছে করে। গরম গরম খাটি দুধের শিরনি। মুখের ভেতর দিলেই যা গলে গিয়ে সেধিয়ে যায় পেটের ভেতর। গলা দিয়ে নামবার সময় দারুণ সুখে জাগিয়ে দিয়ে যায় ঘুম ঘুম ভাব। কতদিন মিষ্টি খাওয়া হয় না। মিষ্টি জিনিষের স্বাদ কেমন সেটাইতো ভুলে গেছে পারুল!

মিলাদে আমৃতি বিলানো হলে বাবা এখন আর যেতে দেয় না তাকে। মেয়ে মানুষ মসজিদে গেলে পাপ! তাছাড়া লোভ করলে মা খুব পেটায়। হাতের কাছে যা পায় তাই দিয়ে পেটায়। চ্যালা কাঠ কিংবা ভাতের চামচ দিয়ে পেটায়।

পেটাবেই না কেন? ঘরে ভাতই নেই তার ওপর এইসব আবদার শুনলে কার না মেজাজ খারাপ হয়। বিগড়ানো মেজাজ নিয়ে চেঁচায় মেজাজ খারাপ করা মা।

ময়নুল এসময় পশুর মতন প্রচণ্ড যন্ত্রণায় কাতড়ায় অসুস্থ শরীরটা নিয়ে। কন্যার শখ পূরণ করতে না পারার হাহাকার তাকে পাগল করে দেয়।

ময়নুল তাই টাকা জমায়। না খেয়ে থেকে টাকা জমায়। ঘরে বিক্রির মতন তেমন কিছু নেই। মাথার ওপর ছাদটা আছে। এই জিনিস বিক্রি করা যায় না। ময়নুল লাকড়ি জমায়। ঘুটে বানায়। কালাইয়ার বাজারে বিক্রি করে একটু একটু করে টাকা জমে।

টাকা জমলে ভালো একটা দিন দেখে মেয়েকে শিরনি খাওয়ানোর জন্যে নিয়ে যাওয়া হয় বাজারে। সেদিন ময়নুল কিছু খায় না। ময়নুল আসলে অনেকদিন ধরেই কিছু খায় না। না খেতে খেতে তার পেটে ঘা হয়েছে মনে হয়। মুখ থেকে রক্ত আসে কয়েকদিন ধরে। কাউকে এ ঘটনা বলেনি সে। কাকে বলবে? বউ তাকে সহ্য করতে পারে না। সারাদিনে গালি ছাড়া আর বাক্যবিনিময় হয় না বউয়ের সাথে। বউয়ের চেয়েও বেশি যন্ত্রণা দেয় কলিজার টুকরা মেয়ে। শিরনি ছাড়া তার জীবনে আর কিছুই নেই। গরিবের মেয়ে বোঝেও না তার আবদার করতেই নেই। ভাত দিয়ে ভাত খেতে পেলেই খুশি থাকা উচিত।

শখের দাম লাখ টাকা। আবদারের দাম তার চেয়েও বেশি। যতই যন্ত্রণা হোক, পশুর মতন রাগ হোক মেয়ের আবদার না মিটিয়ে উপায় নেই। অসহ্য হয়ে ওঠা প্রিয় মেয়ের আবদার এর অবসান হওয়া দরকার। একটা ব্যবস্থা করে গরিব ময়নুল। অনেক তো হলো। এক জীবন টেনে নিতে আজকাল কষ্ট হয়। ঘেন্না ধরে গেছে জীবনের

ওপর। নিজের জীবন নষ্ট হোক তাতে আফসোস নেই। মেয়েকে নিয়েই চিন্তা। মেয়ের জীবনের আবদারগুলো অপূর্ণ থেকে যাবে এটা সে মানতেই পারবে না।

কালাইয়া গিয়ে পারুল পেট ভরে খায়। চেটেপুটে খায় বেহশেতী স্বাদের শিরনি। কী দারুণ রঙ! কী দারুণ স্বাদ! ফেরার পথে আঙ্গুলের ডগায় মাখিয়ে নেয় শিরনির গন্ধ। এ গন্ধ শুকেইতো পার করে দেওয়া যাবে কয়েকটা দিন। বড় ভালো লাগে। চারপাশে ভালোলাগার প্রজাপতি ওড়ে। অনেক অনেক অনেক দিন পর আগুন ধরা পেটটা শান্ত হয়। গলার জ্বলুনি কমে। পারুল আবার শিরনি খাওয়ার স্বপ্ন দেখে। যাওয়ার পথে স্বপ্ন দেখতে দেখতে যায়। আবার শিরনি খাওয়ার আশা করে।

পারুলের আশায় গুড়ে বালি! কালাইয়া থেকে বাড়ি ফেরার পথে পুকুরটার কাছে এসে ময়নুল মেয়ের শরীরে দশ কেজি ওজনের বাটখারা বেঁধে দেয় দুটো। মেয়েটা এটাকে খেলা ভাবে। বাবার সাথে অনেকদিন খেলা হয় না পারুলের। বাবার সে সময় কই? বাটখারা বাঁধার পর পারুলকে ডুবিয়ে দেয় পুকুরের শান্ত নিথর জলে। কি সুন্দর ধীরে ধীরে জল খেয়ে নেয় অপুষ্টিতে ভোগা ছোট্ট শরীরটা তার। পুকুরে একদম পুরোপুরি ডুবে যাওয়ার আগ পর্যন্ত পারুলের মুখে হাসি লেগে থাকে। মনে আনন্দ থাকে। এই আনন্দ শিরনি খাওয়ার আনন্দ। এই আনন্দ বাবার প্রতি কৃতজ্ঞতা জানানোর আনন্দ। পারুল ডুবে যায়। একটু একটু করে একসময় পুরোটাই ডুবে যায়। পুকুর পাড়ে বসে গালে হাত দিয়ে মেয়ের ডুবে যাওয়ার দৃশ্য যতক্ষণ দেখা যায় ততক্ষণ দেখতে থাকে বাবাটা। যন্ত্রণা গেল। বায়না ধরে বিরক্ত করবে না আর কেউ তাকে। শান্তি! ভয়ঙ্কর কঠিন শান্তি।

এত শান্তিতেও কন্যার জন্যে চোখে জল ভিড় করে। কেন কে জানে! নাকি গরিবের চোখে জল নিয়ম না মেনেই আসে। এমনি এমনি আসে। ধুর।

২.

এমন হরহামেশাই হয়। চর এলাকায় এসব অস্বাভাবিক কিছু নয়। তবুও পারুলের ঘটনাটা দাগ কেটে গেল খুব। গ্রামটায় গেলে এখনও পারুলের মায়ের বিলাপ শুনতে পাওয়া যায়। বিলাপ করে ময়নুলও। জেলে বসে মেয়ের জন্য আফসোস করে। জেলে গিয়ে ভালোই হয়েছে। তিন বেলা খাবারের চিন্তা ঘুচেছে। বউয়ের জন্য মন পোড়ে না। মেয়ের জন্য পোড়ে। তা শরীরের যে অবস্থা তাতে মেয়ের কাছে যেতে খুব একটা দেরি হবে না তার। রোগে ভরা শরীরটা নিয়ে খুব বেশিদিন বাঁচবে বলে বিশ্বাস করে না ময়নুল।

চরে গিয়ে পুকুর পাড়ে দাঁড়ালে পারুলের ডুবে যাওয়া জায়গাটায় দেখতে পাওয়া যায় ফুটে থাকা অনেক অনেক পদ্ম ফুল। পদ্ম ফুলের আড়াল থেকে উঁকি মারে জল। মাঝ দুপুরে হলুদ রোদ যখন ফুলগুলোর শরীরজুড়ে খেলা করে তখন ভাগ্য ভালো থাকলে হয়তো কোনো কোনো দিন শুনতে পাওয়া যায় পারুলের কণ্ঠ।

কিন্তু সে কণ্ঠ কেউ শুনতে চায় না। মানুষের অনেক কাজ। অনেক ব্যস্ত সবাই। তাছাড়া গরিব কন্যার কোমল কণ্ঠে লোভ মাখানো সুন্দর, মিষ্টি বায়না শুনতে মানুষের বয়েই গেছে!

কাঠ বাক্সে মা

১.

তমালের মন খারাপ।

একটা লাল রং এর বড় গাড়ি দাঁড়িয়ে হোটেলের সামনে। পেছনে একটা অ্যাম্বুলেন্স। সেটা পো পো আওয়াজ না করে চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকে। তমাল অনেকক্ষণ জানালার পাশে দাঁড়িয়ে থেকে গাড়িটা দেখতে থাকে। রাস্তায় হাজারো মানুষের ভিড়। তমাল তাদের উদ্দেশ্য করে চিৎকার করে বলে, 'ঐ তুমাদের নাম ক্যায়া। ক্যায়া...হুম।' তমাল হিন্দি ভাষার এই বাক্যটা বাবার কাছ থেকে শিখেছে। যখনই জানালার সামনে আসা হয় তখনই ভিনদেশের এই মানুষদের সাথে তাদের ভাষায় কথা বলে দোস্তি পাতানোর চেষ্টা করে সে। কেউই অবশ্য কথার জবাবে বলে না কিছু। একটানা অনেকক্ষণ চিৎকার করে তমাল হোটেলে নিজের ঘরে যায়। গিয়ে দ্যাখে তার ঘরে বসে ছোট মামা কাঁদছে। তমাল কাছে যেতেই মামা তাকে জড়িয়ে ধরে কাঁদতে কাঁদতে বলে, 'তুই আজ সব হারালি। তোর আর কেউ রইল না। কেউ না।' মামার কান্নার কারণ তমাল জানে না। তার কান্না খুব বিশ্রী লাগে। সে মামার কাছ থেকে নিজেকে ছাড়িয়ে আবার জানালার পাশে এসে দাঁড়ায়।

বাবাকে সকাল থেকেই দেখা যাচ্ছে না। কোলকাতায় আসার পর প্রতিদিন তমালকে একটা করে কমিকসের বই কিনে দেয় বাবা। আজ দেয়নি। তমালের তাই মন খারাপ হয়ে আসে। প্রতিদিন সকালে সেদ্ধ ডিম আর পাউরুটি খেতে খেতে তাকে টিনটিন পড়তেই হয়। অগ্নিপুত্র, ফ্যান্টম না পড়লে তার খাবারই হজম হয় না। আজ কখন বই নিয়ে আসবে বাবা কে জানে!

বাবা কখনই এসব ভুলে যায় না। লক্ষ্মী বাবা একটা। কিন্তু আজ কেন ভুলে গেল তমাল জানে না। সকাল থেকে অবশ্য সবকিছুই ওলটপালট হচ্ছে। কেউ আজ তার ঘুম ভাঙায়নি। সে নিজে নিজেই উঠেছে। ঘুম থেকে উঠে কেউ বিছানার পাশে নাস্তা রেখে যায়নি। এমনকি বাবাটা প্রতিদিনকার মতন হাসপাতালে মাকে দেখতে যাবার আগে তার কপালে চুমু খায়নি। এমন চকচকে একটা সুন্দর দিনে সবাই কেন সব কিছু ভুলে যাচ্ছে তমাল তা অনেক চেষ্টা করেও বুঝতে পারে না।

পনের দিনের ওপর হয়ে গেল তমালরা কলকাতায় এসেছে। একটা লাল রং এর গাড়ি ভাড়া করে বেনাপোল হয়ে আসতে হয়েছে তাদের। পার্ক স্ট্রিটের একটা মাঝারি মানের হোটেলে উঠেছে সবাই। আসার দুই দিন পরেই মাকে ভর্তি করা হয়েছে 'কোটারি' হাসপাতালে। মা অসুস্থ। অনেক বড় একটা অসুখ হয়েছে তার। অপারেশন করতে হবে। চিকিৎসার জন্যে আসা হয়েছে কলকাতায়।

হাসপাতালে মায়ের সাথে তমালের দেখা করবার উপায় নেই। ছোটদের হাসপাতালে যাওয়া নিষেধ। শুধু এখানকার ছুটির দিন রোববারে তমাল কিছুক্ষণের জন্যে মায়ের দেখা পায়। সেদিন মা খুব আদর করেন। বুকের ভেতর তমালের মাথাটা চেপে ধরে বসে থাকেন অনেকক্ষণ। এ সময় মায়ের চোখ থেকে জল পড়তে থাকে। একটু পর পর সে জিজ্ঞেস করে, 'আমি যদি আর না থাকি তবে বাচ্চাটা আমার ঠিকঠাক থাকবে তো? পড়াশোনা করবে তো? ঠিকঠাক মতন খাওয়া-দাওয়া করবে?' তমাল মায়ের প্রশ্নগুলো মনোযোগ দিয়ে শোনে না। সে প্রতিটা প্রশ্নের জবাবে শুধু, 'হুম, হু।' বলে। আসলে কথা না বলে মায়ের বুকে মাথা গুঁজে বসে থাকতেই ভালো লাগে। এ সময় তার নিজের বাড়িটার জন্য মনটা আনচান করে। ভিসা নিয়ে কি একটা ঝামেলার কারণে বড় বোনকে বাড়িতে রেখে আসতে হয়েছে। তমালের বড় বোনটার কথা মনে পড়ে খুব। স্কুলে বার্ষিক পরীক্ষা দিয়ে আসা

হয়নি। বন্ধুরা হয়তো তাকে ভুলে গিয়েছে। কতদিন বাড়ির সামনের মাঠে বোমবাস্টিং খেলা হয় না। টিফিনের টাকা জমিয়ে টম অ্যান্ড জেরির পোস্টার কেনা হয় না। হয় না বিকেলবেলা হটপেটিস খাওয়া। লুডু খেলায় হেরে গিয়ে বোনের মাথার চুল ছেড়া হয় না অনেকদিন। বাবা সন্ধ্যেবেলা পড়াতে বসিয়ে বলে না, 'তমাল বলতো, শামসুর রাহমান কে ছিল? আচ্ছা রম্বস কি? সলোমন গ্রান্ডে কবিতাটা ঠিকঠাক করে বলতো একদম।' মা গরম গরম কুয়ো পিঠা ভেজে নিয়ে এসে বলে না, 'নে নে তমাল, ঝটপট খেয়ে নেতো। আর শোন, বেশি মিষ্টি খাস না। দাঁতের যা অবস্থা!'

তমালের বাড়িতে যেতে ইচ্ছে করে। সে চায় সবকিছু আগের মত হোক আবার। এখানে তার কান্না পায়। কিছুই ভালো লাগে না। ভালোর মধ্যে একটু প্রতিদিন বাবা একটা কমিকসের বই কিনে দেয় এই যা!

গতকাল অপারেশন নাকি হয়েছে মায়ের। সুস্থ হলে খুব শীঘ্রই বাড়ি ফিরবে তারা। তমাল প্রার্থনা করে মা যেন সুস্থ হয় তাড়াতাড়ি। তাড়াতাড়ি যেন ফেরা যায় বাড়ি।

হোটেলে ঘরের দরজার সামনে অনেক মানুষের ভিড়। কান্না থেমেছে একটু মামার। একের পর এক ফোন দিয়ে যাচ্ছে সে। প্রতিবার ফোনে কথা বলার সময় অবশ্য কেঁদে উঠছে ফুঁপিয়ে। সকাল গড়িয়ে দুপুর হচ্ছে এখন। তমালের কমিকসের বই আসেনি। কেউ তাকে খাবারও দিয়ে যায়নি। তমালের ক্ষিধে পেয়েছে। সে ক্ষিধেটা একদম সহ্য করতে পারে না।

হোটেলের দরজা দিয়ে বাইরে এসে তমাল বাবাকে দেখতে পায়। মোটা ফুলো ফুলো দুটো লাল চোখ পড়ে বাবার। তমালের রাগ হয় বাবাটার ওপর। মায়ের কাছে হাসপাতালে না গিয়ে এই অ্যাম্বুলেন্সের সামনে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে অবাকও লাগে। সে ছুটে গিয়ে বাবার পাশে দাঁড়ায়। তারপর বলে, 'মাকে দেখতে হাসপাতালে যাবে না বাবা। কালতো রোববার। আমি কি মাকে দেখতে পাবো?' প্রশ্ন শুনে তমালের বাবা চুপ থাকে কিছুক্ষণ। তারপর বলে, 'তোমার মাকে দেশে নিয়ে যাচ্ছি। আর হাসপাতালে যেতে হবে না। তোমার মা আজ আমাদের সাথে দেশে যাবেন। এখন যাও হোটেলের ভেতর যাও। আজই রওনা দেবো আমরা। মামাকে গিয়ে বলো তোমার কাপড়চোপড় গুছিয়ে ব্যাগে নিতে। যাও।' বাবার কথা শুনে তমাল হোটেলের ভেতর চলে আসে। আজই ফেরা হবে শুনে ভালো লাগে। কিন্তু সে সকালে খায়নি, তাকে কমিকসের বই কিনে দেওয়া হয়নি এসব নিয়ে বাবার কোনো চিন্তাই নেই দেখে রাগটা বাড়ে। সে কাপড় গোছানোর কথা মামাকে না বলে জানালার কাছে গিয়ে দাঁড়ায়। দ্যাখে বাবা দাঁড়িয়ে আছে এখনও অ্যাম্বুলেন্সের কাছে। সেও মামার মতন কাঁদছে কি? এসব দিকে নজর না দিয়ে রাগ করা তমাল রাস্তার হাজারো অচেনা মানুষের দিকে তাকায়। তারপর বলতে থাকে, 'এই তুমাদের নাম ক্যায়া? বলোনা নাম ক্যায়া।' কেউ জবাব দেয় না। তমালের মনে হয় এই পৃথিবীটা খুব বাজে। খুব পচা। অপারেশন শেষে মা সুস্থ হোক তারপর নালিশ দেওয়া হবে। বাবা, ছোট মামা, বড় বোন, তার কথা জবাব না দেওয়া রাস্তার হাজারো অচেনা মানুষের নামে নালিশ দেওয়া হবে। মা শাস্তি দেবে সবাইকে। কঠিন শাস্তি। জানালার পাশে দাঁড়িয়ে তমাল তাই প্রার্থনা করতে থাকে, 'মা ফিরে আসুক। মা ফিরে আসুক। মা ফিরে আসুক।'

২.

দারুণ গতিতে ছুটছে একটা লাল গাড়ি। পেছনে পেছনে পো পো করে আসছে একটা অ্যাম্বুলেন্সও। বাড়ি ফিরছে তমাল। তার মন ভালো হবার কথা। কিন্তু কেন জানি খারাপ লাগছে খুব। মনে পড়ছে মায়ের কথা। কাল

রবিবার। মাকে দেখতে পাবার কথা কাল। গাড়িতে বসে মাকে দেখার কথা বাবাকে বলতেই কেঁদে উঠেছে সে। বলেছে মা তাদের সাথেই আছে। আসছে পেছনের গাড়িতেই। একটা কাঠের বাক্সের ভেতর নাকি ঘুমিয়ে সে। মা কেন পেছনের গাড়িতে থাকবে? কেন বিছানা ছেড়ে কাঠের বাক্সে ঘুমাবে? কেন তাদের সাথে যাচ্ছে না? মা কেন তমালকে বুকের মধ্যে নিয়ে বলছে না, আমি চলে গেলে ঠিক থাকবি তো তমাল?

চারপাশের অদ্ভুত কাণ্ডকারখানা দেখে ছোট্ট তমালের এলোমেলো লাগে সব। মন ভার করে সে গাড়ির জানালা দিয়ে বাইরে তাকায়। এখন রাত। এদিকের রাস্তায় তমালদের গাড়ির হেডলাইট ছাড়া অন্ধকার আর সব। জানালা দিয়ে দূর দূরের অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে তমালের ভয় লাগে। অন্ধকারকে ভয় পায় তমাল। বাড়িতে থাকতে রাত হলেই ভূতের ভয়ে মায়ের কাছে গিয়ে বসে থাকা হতো। মা তখন তাকে একটার পর একটা সোনার কাঠি, রুপোর কাঠি, সূচ রাজকন্যার গল্প শোনাত। ভয় কেটে যেত তখন। মা এখন নেই পাশে। তমালের কেন জানি খুব একা লাগে। ছোট্ট বুকটায় কি যেন হয়। গলার কাছে এসে কান্নার মতন আটকে যায় কিছু একটা।

মা কি ফিরে আসবে? অজানা আশঙ্কায় তমাল আচমকা ডাকতে থাকে মা, মা বলে।

এই প্রথম তার কান্না পায়। গাড় অন্ধকারের ভেতর ডুবে থাকা লাল গাড়িটার ভেতর বসে এই প্রথম সে কাঁদে। কাঁদে।

প্রবঞ্চন

রাতের আঁধারে বিশটি সাপ হোটেলের লবিতে এলোমেলোভাবে ঘুরে বেড়ায়।

জামান খান সিগারেট পোড়াতে থাকেন একটার পর একটা। তার লাঞ্চের অবস্থা ভালো না। ডাক্তারের কড়া নিষেধ আছে সিগারেট খাওয়ার ব্যাপারে। টেনশনের সময় কারো কথা শোনার উপায় নেই। ফোন বাজতে থাকে। জামান খানের প্রথম বউ কল দিচ্ছে। ফোন ধরার ইচ্ছে নেই। দজ্জাল এই মেয়ের সাথে কথা বলতে ভালো লাগে না। ফোনটা সাইলেন্ট মুডে দিয়ে রাখে জামান খান।

লাউয়াছড়া জঙ্গল থেকে অনেক ভেতরের দিকে এই হোটেল। ঠিক হোটেল না। ছোটখাটো একটা রিসোর্ট। মাটির পথ ধরে গাড়ি চালিয়ে আসতে হয়। চারপাশে সবুজের দখলদারি। বানর চোখে পড়ে। এই ডাল, ওই ডাল ঘুরে বেড়ায়। মুখপোড়া হনুমানও আছে মনে হয় কিছু। সারাক্ষণ বিশ্রী আওয়াজ করে। রিসোর্টের বাংলোগুলোর টিনের ওপর এসে লাফায়। লোকজনদের এটা ওটা নিয়ে যায়। সাহস কম না! ঢিল মারলেও ঠায় দাঁড়িয়ে থাকে।

এই ভেতরের জঙ্গলে দরকার না পড়লে মানুষ আসে না তেমন একটা। মাঝে মাঝে একটা-দুটো আদিবাসী চোখে পড়ে। ওদের বাড়ি কই কে জানে! চোখে পড়ে লেবুর ক্ষেত আর আনারসের ক্ষেত। কারা এসব চাষ করে তাও জানা নেই। প্রচুর ছোট ছোট সাপ আসে। মাটির রাস্তায় হুটহাট করে উঠে আসে সাপ। রিসোর্টের লোকজন বলেছে এসব সাপে বিষ নেই। তবুও ভয় লাগে।

একটা রিয়ালিটি শো এর শুটিং হচ্ছে। বড় আয়োজন। অনেক টাকার ব্যাপার স্যাপার। চ্যানেলের লোকজন আছে এখানে। কর্পোরেট এর রাঘব বোয়ালরাও আছে। বাজেট অনুযায়ী টাকা পয়সা হাতে চলে এসেছে অনেক আগেই। এখন কোনো রকমে প্রোগ্রাম নামলেই। লোকজন দেখুক আর না দেখুক এতে কিছু আসে যায় না।

গতকালই এখানে এসে পৌঁছেসে চ্যানেলের লোকজন। রাতে সোলার আর বেবী লাইট দিয়ে শুটিং হয়েছে কিছুক্ষণ। তারপর থেকে দেদার চলছে মদ খাওয়া। পার্টি। অল্প খরচে আনা হয়েছে কিছু সস্তা মেয়ে মডেল। রাঘব বোয়ালদের খুশি করতে ব্যস্ত তারা।

জামান খানের এসব ভালো লাগে না। অনেক তো হয়েছে। শরীরের প্রতি আর আগ্রহ নেই। কম বয়সে ছিল। নায়িকাদের কাপড় হাঁটুর ওপর উঠলেই মাথা খারাপ হয়ে যেত। সেসময় প্রোডাকশন বয় ছিল জামান খান। অনেক কষ্ট করতে হয়েছে। একটু আধটু এডিটিং পারত। ক্যামেরার কাজ ভালো লাগত। ক্যামেরাম্যানের পেছনে পেছনে ঘুরত। ককশিট, রিফ্লেক্টর ধরতে হতো। অনেক অপমান সহ্য করেও ক্যামেরার কাজটা শিখেছে সে। এটাই বদলে দিয়েছে ভাগ্য। ক্যামেরাম্যান হিসেবে নাম ডাক হয়েছে তার। শট ডিভিশন, ব্রেক ডাউন, স্ক্রিপ্ট এর কাজ শিখতে দেরি হয়নি তার। পরিবারের আর্থিক অবস্থা। বড় ছেলে। অনেক ঝামেলার ভেতর একটা বিয়েও করে ফেলেছিল। সে বিয়ে টেকেনি। পকেটে টাকা আসার সাথে সাথে বউ বদলানো হয়েছে। আগের বউ নিরক্ষর। এই বউকে নিয়ে সব জায়গায় যাওয়া যায় না। তাই নায়িকা বিয়ে করা হয়েছে। নায়িকার অনেক বয়ফ্রেন্ড। এর মাঝে কোনো একজনের সাথে বাজে এমএমএস ছড়িয়ে পড়েছে। নায়িকা মানসিক টানাপড়েনের ভেতরে ছিল। এই সময়ের সুযোগ নিয়েছে জামান খান। মেয়ে ভালোবেসে ফেলেছে। বাচ্চা চলে এসেছিল। তাই অনেকটা বাধ্য হয়েই বিয়ে করেছে জামান খানকে।

জামান খান প্রথম বউকে তালাক দেয়নি। দুই বউ আলাদা থাকে। প্রথম বউয়ের ঘরে একটা ছেলে আছে। মাস শেষে টাকা পাঠিয়ে দিতে হয়। এ এক যন্ত্রণা। মায়া হয় বলে তালাক দেওয়া হয় না। ছেলের জন্য পাউডার দুধ কিনতেই অনেক টাকা বেরিয়ে যায়। দ্বিতীয় বউ প্রথমে বিরক্ত করত। এখন সেও মেনে নিয়েছে। দ্বিতীয় বউয়ের বাচ্চাটা হব হব করবে।

দুই বউয়ের কোনোটাকেই সহ্য হয় না আজকাল। জামান খান প্রেমে পড়েছে আবার। ভয়ঙ্কর প্রেমে পড়েছে। মাঝবয়সের প্রেমে উথালপাথাল আবেগ থাকে। মেয়েটার বয়স অল্প। এই অনুষ্ঠানের উপস্থাপিকা। পাগল করে দেবার জন্য যথেষ্ট। এই মেয়ে ঢং জানে। পুরুষ ফাসানোর ছলাকলা জানে। জামান খান ফেসে গেছে। কঠিনভাবে ফেসে গেছে। প্রায় এক মাসের টানা শুট। প্রতিদিন কাছে আসছে তারা। ভালোবাসা জমে উঠেছে। মেয়ে হার মেনেছে। জামান খানের হয়েছে। শুটিং- এ শরীরে শরীর মিলেছে। উপস্থাপিকাকে আর সবার কুনজর থেকে বাঁচানোর দায়িত্ব নিয়েছে। এ নিয়ে প্রডিউসারের সাথে ঝামেলা হয়েছে। এই মেয়েকে চেয়েছিল সে। জামান খানের জন্য কিছু করতে পারছে না। অনুষ্ঠানের এই পর্যায় এসে ডিরেক্টরকে বাদ দিলে বদনাম হয়ে যাবে তাই কিছু বলাও যাচ্ছে না।

বাইরে খেকশিয়ালের মতন কিছু একটা ডাকে। একটা বিড়াল কি কান্না করে? সাপগুলো ঘুরে বেড়ায় এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায়। সাপগুলো সকালে আনা হয়েছে। এই শো এর জন্য লাগবে। সাপ ছেড়ে দেওয়া হবে গর্তের ভেতর। ভেতরে ফেলা হবে পনেরটি কয়েন। সেখানে হাত ডুবিয়ে প্রতিযোগীদের কয়েন খুঁজে বের করে আনতে হবে। সবার সাহস দেখা হবে। যাচাই-বাছাই শেষে সবচেয়ে সাহসীই হবে চ্যাম্পিয়ন। সাপুড়ে আনা হয়েছে এলাকা থেকে। হাজার পাঁচেক টাকায় রফা হয়েছে। সাপুড়ে থাকবে দুইদিন এখানে। তার খাওয়া দাওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে। সাপগুলোর বিষ নেই। সবুজ রং এর সাপগুলো ঢং জানে। ফণা তোলে। বিষ নেই তবুও ভয় দেখায়। শরীর পেঁচিয়ে ধরে। একসাথে পাশাপাশি দেখলে ভয় হয়।

সাপুড়ে ভদ্র মানুষ। খুব পান খায়। ঠোঁট বিশ্রী রকমের লাল। যেখানে সেখানে পিক ফেলে। সাপগুলোকে সোনাপাখি, ময়নাপাখি বলে। বাজে হলুদ দাঁত নিয়ে কয়েকটা সাপ হাতে নিয়ে বলে, 'ইগুলান আমার পেমিক। এক মাইনষের লগে বিশখান সাপের পেম। তাজ্জব কাণ্ড।' এই লোককে হাত করেছে জামান খান।

জামান খানের দুই বউই এসে উপস্থিত এখানে। ইন্ডাস্ট্রিটা ছোট। কোনো কথাই চাঁপা থাকে না। সব খবর ছড়ায়। তার বউ দুজনই জেনেছে উপস্থাপিকার সাথে কিছু একটা হয়েছে। গভীরভাবে হয়েছে। নিজেদের মধ্যে সবসময় ঝগড়া দুই বউ স্বামীকে প্রেম করতে দেবে না, ভালোবাসতে দেবে না এই ব্যাপারে একমত হয়েছে। শুটিং কোথায় হচ্ছে তা জেনে চলে এসেছে এখানে। লজ্জায় ফেলেছে জামান খানকে। তারা বুঝতে পারছে না এটা শুটিং। ভাবছে পারিবারিক কোনো উৎসব।

জামান খানের বদনাম হয়ে যাবে। সে ভয়ানক বিরক্ত। তার আখান্দা বলদ দুই বউয়ের ওপর বিরক্ত। জীবনটা তামা তামা করে দিল! এভাবে আর হচ্ছে না। হওয়া উচিতও না। মেয়ে মানুষই আসলে এমন। সময়জ্ঞান বোঝে না। গতকাল উপস্থাপিকা এসে বলল সে পেট বাঁধিয়ে ফেলেছে। কি বিপদ! এটা কোনো পেট বাঁধানোর সময় হলো। দুনিয়া কত এগিয়ে গিয়েছে। কতসব চিকিৎসা আছে। জামান খান আসলে সত্যি সত্যি ভালোবাসে। ঘর বাঁধার স্বপ্ন দেখে। তাইতো বাচ্চা নষ্ট করবার কথা একবারও ভাবেনি। এমন চিন্তা করাও পাপ। কিছু কিছু ব্যাপারে পরিচালক জামান খানের নীতি টনটনে।

সাপগুলো ঘুরে বেড়ায়। এদিক ওদিক, এ রুম থেকে ও রুমে ছড়িয়ে পড়ে। খুঁজতে থাকে কাঙ্ক্ষিত মানুষটিকে। প্রেমিক সাপুড়ের কথা তো ফেলে দেওয়া যায় না। জামান খান সবকিছু বুঝিয়ে দিয়েছে ঠিকঠাক মতন। সাপুড়ে বুঝেছে। কোন দু'রুমে সাপ ঢুকবে। বিষধর কোন সাপটি দংশন করবে সবকিছু বোঝানো হয়েছে।

সাপুড়ে কোনো ভুল করে বসতে পারে। জীবনে এমন কাজ তো করেনি আগে আর। বিষ দিয়ে মানুষ মারা তো সহজ নয়। ভুল হলেই বিপদ। ধরা পড়ার সম্ভাবনা। জামান খান সবকিছু ভেবে রেখেছে। যে ঘটনা ঘটছে পুরোটা ডিরেকশন সে ঠিকমতই দেওয়ার চেষ্টা। বিশটা সাপ নিয়ে হইচই শুরু হবে। আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়বে সব জায়গায়। পড়িমরি করে দৌড়াবে লোকজন। পালাবে। পুরো ব্যাপারটা দুর্ঘটনা এই ব্যাপারটা বোঝানো সহজ হবে এতে।
পুরো ব্যাপারটা ঠিকমতন ঘটবার কয়েকদিন পর সাপুড়েকে গায়েব করে দিতে হবে। বোকাসোকা লোক অপরাধের কথা চাঁপা রাখতে পারে না। কোনো ঝামেলা হলে ফেঁসে যাবে জামান খান। এমনটা হতে দেওয়া যাবে না।
হইচই শুরু হয়। হট্টগোলের ভেতর কারো কারো কান্নার আওয়াজ শোনা যায়। জামান খান রিসোর্টের একটা খালি রুমে ঢুকে বাইরে থেকে দরজা বন্ধ করে দেয়। চিৎকার- চেঁচামেচি ভালো লাগে না। সবকিছুই তার প্লানমতন হচ্ছে তবুও চিন্তা হয় খুব। একটু মন খারাপও লাগে। অভ্যাসে মায়া জন্মায়। ভালোবাসা হয়। বউ দুটোর সাথে কম দিন কাটানো হয় নাই। বউ দুটোর সাথে অনেকদিন হল। মরলে খারাপই লাগবে জামান খানের। এমন হোক চায়নি সে। কিন্তু খুবই বিরক্ত করে মেয়ে দুটো। এভাবে চললে তার জীবনটা নষ্ট হবে।
প্রথম বউকে ভালোবেসেছিল। সে ভালোবাসার ছিটেফোঁটাও নেই এখন আর। তবে মনে পড়ে একদিন বউকে বলেছিল কোনোদিন সে বউকে ছেড়ে যাবে না। বউকে দেখে রাখবে। অন্য কোনো মেয়েকে ভালোবাসবে না। একই কথা বলেছিল দ্বিতীয় বউকেও। কথা রাখতে পারেনি। সে কি প্রতারণা করেছে? করলে করেছে। জীবনে একটু আধটু প্রতারণা করতেই হয়। এত ভাবলে চলে না। শুধু তার সাথে কেউ প্রতারণা না করলেই হলো। বুদ্ধিমান জামান খানের সাথে কোনো মানুষ প্রতারণা করার সাহস রাখে এটা সে বিশ্বাসও করে না।
মানুষ না করুক সাপতো করতে পারে। বিষধর সাপগুলো সাপুড়ের কথা শোনে না। দুই বউকে কাটে না। মেঝের ওপর দিয়ে তাদের পেঁচানো, পিচ্ছিল শরীরটা নিয়ে তারা এগোতে থাকে জামান খানের ঘরটার দিকে। স্বাভাবিক সময়ের চেয়ে খুব দ্রুত এগোয়। মালিকের সাথে প্রতারণা করা বিষধর সাপ। কথা না শোনা বিষধর সাপ।
হতাশ হওয়ার কিছু নেই। দুনিয়া সুন্দর। এখানে সবাই প্রতারক নয়। প্রতারক হলে বিষে নীল হওয়া জামান খানকে দেখে একটু পর দুই বউয়ের কাঁদার কথা নয়। দুই বউ কাঁদবে। উপস্থাপিকা কাঁদবে। এ কান্না ভালোবাসার। প্রতারণার দুনিয়ায় এ কান্না অপ্রতারণার! অবাক লাগে। এমনও হয়? এমন হতে নেই।

স্বর্ণভূমি

১.

আমেনা বেগম। বয়স এক দিন।

আজ শনিবার। আমার ছুটির দিন। এই সময়ে আমার ঘুমানোর কথা ছিল। ছুটির দিনে দশটার আগে ঘুম থেকে উঠি না। আজকের আবহাওয়া ঘুমের জন্য ভালো। বৃষ্টি হচ্ছে। আকাশের শরীর ভর্তি মেঘ। বাতাসে কেমন একটু শীত শীত ভাব। এমন আবহাওয়ায় কাঁথা গায়ে ঘুমানো দরকার। দরকার হলেও আমি ঘুমাতে পারছি না। চোখে রাজ্যির ঘুম ভর করলেও আমার ঘুমানোর উপায় নেই। আজ আমার বোনের মেয়েটা মারা গেছে। আমি এখন আজিমপুর কবরস্থানে। এমন সময় ঘুমানো নিষেধ আছে। এমন সময় কাঁদার নিয়ম।

আজিমপুর কবরস্থানে মানুষের ভিড় লেগেই থাকে। একের পর এক লাশ নিয়ে আসছে মানুষ। সব সাদা কাপড়ে মোড়ানো। লাশের সাইজ দেখে আমি বয়স বের করার খেলা খেলছি। কারো বয়স দশ, কারো ত্রিশ আবার কারোবা ষাট। এমনি খেলার জন্য খেলা। চেহারা দেখে বয়স মিলিয়ে নেবার উপায় নেই। শোকে কাতর একদল মানুষের কাছে গিয়ে বলতে পারি না যে, 'ভাই বেরাদার আপনাদের কাছের মানুষটার কাফনের কাপড়টা একটু তুলবেন? চেহারা আর সাইজ দেখে বয়স বের করবার খেলা খেলছি। চেহারাটা দেখা দরকার। প্লিজ।' এটা সম্ভব না। মানুষজন খেপে যাবে।

আমার আসলে এই মুহূর্তে করার কিছু নেই। গত তিন রাত ঘুমাতে পারিনি। সবকিছু এলোমেলো লাগছে। এত ক্লান্ত যে ঠিকমতন বসে থাকতে পারছি না। আমি একটি বিজ্ঞাপন সংস্থায় কাজ করি। কপিরাইটিং এর কাজ। কোনো পণ্য কেমন ভালো এইসব নিয়ে ভালো ভালো কথা লিখতে হয়। যত ভালো লেখা তত বেশি পয়সা। গল্প, উপন্যাসও লিখি আমি। গল্প লিখতে বেশি ভালো লাগে। কিন্তু এসবে পয়সা নেই। মানুষ আজকাল বই পড়ে না। সময় কই?

বৃহস্পতি আর শুক্রবার শুটিং ছিল। নাটকের শুটিং। ইদানীং নাটক লিখছি। নাটকে পয়সা আছে। দেশের একজন প্রখ্যাত নাট্যকারের জন্য নাটক লিখি। লেখক হিসেবে আমি এখনও তেমন জনপ্রিয় না বলে তার নামে লিখতে হয়। নাটকে চিত্রনাট্যকার হিসেবে আমার নাম যায় না। তিনি নাটক প্রতি আমাকে পাঁচ হাজার টাকা দেন আর নিজে দশ হাজার টাকা রাখেন। আমি তার প্রতি কৃতজ্ঞ। এই মন্দার বাজারে পাঁচ হাজার টাকা দেওয়ার মতন দয়ালু মানুষ খুঁজে পাওয়া সহজ কথা নয়। সামনে ঈদ। নাটক লেখার চাপ খুব বেশি। তিনি বলেছেন, ভালো নাটক লিখে যদি তাকে সেরা চিত্রনাট্যকার হিসেবে পুরস্কার পাইয়ে দিতে পারি তবে এরপর থেকে নাটকে সহকারী চিত্রনাট্যকার হিসেবে আমার নাম দেবেন।

বৃষ্টি কমে আসছে। আকাশ পরিষ্কার হচ্ছে। আকাশের কোন এক কোনা হতে এক টুকরো রোদ এসে হাজির হয়েছে পৃথিবীতে। চারপাশের সবকিছু কেমন পরিষ্কার পরিষ্কার লাগছে। ভালো। পৃথিবীটাকে এই মুহূর্তে সুন্দর মনে হচ্ছে।

'ওযু করো ভাই। কবর দিতে দেরি নাই। সাবান, বাঁশ কেনা হইছে।' আমার দুলাভাইয়ের কাঁদো কাঁদো কণ্ঠ শুনে তাকালাম। তিনি আশেপাশেই ছিলেন। তার মেয়েটা মারা গেছে আজ। মেয়ের বয়স এক দিন। এক দিনে কি

এমন মায়া জন্মায় মানুষের জন্য যে কাঁদতে হবে! আমি বুঝি না। মায়া-মহব্বতের ব্যাপারগুলো আমার মাথায় ঢোকে না।

ওযু করে নিলাম। শান্তি শান্তি লাগছে। গত তিনদিনে এই প্রথম শরীরে পানি লাগানোর সুযোগ পেলাম। আমার ঘুমটা কাঁটছে। একটু চা খেতে পারলে ভালো হতো। চায়ের চেয়ে পছন্দের কিছু এই পৃথিবীতে আমার আর নেই। ফোন আসছে। বাবা ফোন করেছে। তিনি ঢাকার বাইরে। মেয়ের এই কষ্টের সময় পাশে থাকতে পারলেন না। তার মন খারাপ। তিনি একটু পর পর আমাকে ফোন দিয়ে কাঁদছেন। আমি ফোন ধরলাম না। ফোনে বয়স্ক একজন মানুষের কান্না শুনতে একদমই ভালো লাগে না।

আমি একটা গল্প লেখার প্লট ভাবছি। আমেনা বেগমকে নিয়েই একটা গল্প লেখা যায়। তার জন্ম রাত তিনটার কিছু পরে। পঁয়তাল্লিশ মিনিটের মতন বেঁচে ছিল আমেনা বেগম। তার জ্ঞান ছিল না। সে একবারের জন্যও চোঁখ খোলেনি। পৃথিবীর আলো দেখবার সৌভাগ্য তার হয়নি। তার নাকে লাগানো ছিল অক্সিজেনের নল। পৃথিবীর এত এত বাতাসে সে স্বাধীনভাবে নিঃশ্বাস নিতে পারেনি। দারুণ কষ্ট হয়েছে মরতে। এই মৃত্যু আর বেঁচে থাকা নিয়ে একটা গল্প দাঁড় করানোই যায়। গল্প চেয়েছে একটা সাহিত্য পত্রিকার সম্পাদক। প্রথম বইটা বের হওয়ার পর আমার পরিচিতি বাড়ছে। অনেকেই গল্প চায় ছাপানোর জন্য। নিজের নামেই ছাপাতে পারি। শুধু নাটকেই অবস্থা খারাপ।

গত দুই দিনের শুটিং শেষে আমি স্পটেই থেকেছি। চিত্রনাট্যকার (যদিও আমার নাম ছাপা হয় না) হয়েও প্রোডাকশনের বয়ের কাজ করতে হয়েছে। নায়কের কস্টিউম এর লিস্ট ছিল আমার কাছে। লিস্ট মিলিয়ে মিলিয়ে সেসব পড়িয়ে দেবার দায়িত্বও ছিল আমার। প্রথম দিন টানা উনিশ ঘণ্টা শুটিং হয়েছে। শুটিং শেষে বাড়িতে যেতে পারিনি। অত রাতে আমার বাসার গেট বন্ধ হয়ে যায়। তাছাড়া যাওয়ার জন্য সিএনজি, রিকশা কিছুই পাওয়া যাচ্ছিল না। আমি বরাবরই লাজুক। প্রোডাকশন থেকে কিছু চাইতে পারি না। গুরুত্বপূর্ণ কেউ নই বলে কেউ আমাকে তেমন পাত্তাও দেয় না। প্রোডাকশনের খাবার পাইনি। রোযা ছিলাম সারাদিন। ইফতার করেছি বাইরে। সেহ্‌রি করতে পারিনি। প্রোডাকশনের কেউ আমাকে ডাকেনি। না খেয়েই রোজা রেখেছিলাম শুক্রবার। শুটিং হয়েছে সকাল থেকে। প্রোডাকশনের খুব অল্প মানুষই রোযা রাখে। যত যন্ত্রণা আমার। কাউকে মুখ ফুটে বলতে পারিনি, আমার একশ দুই ডিগ্রি জ্বর। আমাকে কি ছুটি দেওয়া যায়? ডিরেক্টর কয়েকবার প্রোডাকশন বয় মনে করে আমাকে গালিগালাজ করেছে। তিনি আসলে জানেন না এই নাটক আমার লেখা। প্রখ্যাত সেই নাট্যকার তাকে কিছু বলেনি। আমাকে এই শুটিং এ পাঠিয়েছেন সবকিছুর খোজ খবর রাখার জন্য। বলেছেন সব ঠিকঠাকমতন করতে পারলে এরপর থেকেই সহকারী চিত্রনাট্যকার হিসেবে আমার নাম তিনি দেবেনই দেবেন। সেই লোভে অফিস থেকে ছুটি নিয়ে এখানে পড়ে আছি। কষ্ট হলেও করে যাচ্ছি কাজ।

গতকাল রাত সাড়ে বারটার দিকে মা ফোন দেয়। তখন শুটিং চলছিল। নায়ক, নায়িকার রোমান্টিক দৃশ্য। যতটা না চিত্রনাট্যে লেখা আছে তার চেয়েও বেশি রোমান্টিক হচ্ছিল নায়ক আর নায়িকা। নায়িকার পরনে সংক্ষিপ্ত পোশাক। সে সামান্য পোশাকটুকু রাখতেও যেন তার আপত্তি। পুরো প্রোডাকশন তাকে দেখছে। আমি লেখক, মহাপুরুষ নই। আমিও তাই দেখছি। লোমহীন হাত, পা দেখতে ভালোই লাগে!

এইসব ভালো লাগার ভেতর মায়ের ফোন ধরবার ইচ্ছে ছিল না তবুও ধরলাম। ফোনে কাঁদো কাঁদো স্বরে মা বলল, বোনটা অসুস্থ, ব্যথা উঠেছে। কাজ ছেড়ে আসতে হবে এখনই। বাবা ঢাকার বাইরে। বাড়িতে দুলাভাই আছে। চিন্তার কিছু নেই। মাকে ধমক দিলাম। জরুরি কাজ ছেড়ে আমার যাওয়ার উপায় নেই। মায়ের সাথে কথা বলার কিছুক্ষণ পরেই ফোন দিল বাবা। বলল, বোনের অবস্থা বেশি খারাপ। আমি যেন এখনই বাসায় যাই। প্রখ্যাত নাট্যকারকে ভয়ে ভয়ে ফোন দিলাম। ভয় হচ্ছিল, বাসায় যাওয়ার কথা বললে তিনি না আবার সহকারী

চিত্রনাট্যকার হিসেবে নাম দেবার কথা বাতিল করে দেন। নাট্যকার ফোন ধরলেন না। ডিরেক্টরকে বললাম। তিনি কথা শুনে বিরক্ত হলেন। বললেন, এত ঝামেলা নিয়ে শুটিং করতে ক্যান আসেন? আমি জবাব দিলাম না। চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইলাম। মনে হচ্ছিল বাসায় যেতে চেয়ে অনেক বড় একটা অপরাধ করে ফেলেছি। একটু থেমে তিনি বললেন, 'আচ্ছা যান।' আমি হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম।

রাত একটার দিকে বনানীতে কোন বাস পাচ্ছিলাম না। বোনের বাসা মিরপুরে। সৈনিক ক্লাব দিয়ে হেটেই রওনা দিলাম। বাসায় পৌঁছাতে পৌঁছাতে অনেকবার ফোন দিলেন মা, বাবা আর দুলাভাই। ধরলাম না। বাসায় পৌঁছেই দেখি হাসপাতালে যাওয়ার জন্য তৈরি হচ্ছে সবাই। একটানা হেঁটে আমার অবস্থা খারাপ। বিশ্রাম নেবার সময় পেলাম না। বোনকে দেখলাম ব্যথায় চিৎকার করছে। তাকে কোলে করে তোলা হলো গাড়িতে। মা কাঁদছে। কাঁদতে কাঁদতে বললেন সূরা পড়তে। আমি সূরা ফাতিহা সবচেয়ে ভালো জানি। ওটাই জোরে জোরে পড়া শুরু করলাম। হাসপাতালে নিতে দেরি হয়ে গেছিল অনেক। আমার জন্য অপেক্ষা করছিল সবাই। বোনের বাচ্চা হবার সময় ভাই পাশে থাকবে না এটা কেমন কথা!

গাড়িতেই বাচ্চা মায়ের গর্ভ ছেড়ে বের হয়ে এসেছিল অনেকটা। হাসপাতালে নেওয়ার পর জানাল এই বাচ্চা বাঁচানো কঠিন হবে। সবাই কাঁদছিল। মা বেহুঁশ হয়ে পড়ল। দেখলাম আমার খালা তার মাথায় পানি দিচ্ছে। বাইরে বৃষ্টি হচ্ছিল। বর্ষাকাল মনে হয়। এত বৃষ্টি নইলে হবার তো কথা না। হাসপাতালের ভেতর এসির ঠাণ্ডা বাতাস। আমার ঘুম পাচ্ছিল। আমার এসব নিয়ে মাথাব্যথা নেই। আমি হাসপাতালের করিডরের ঠিক পাশেই একটু নীরব জায়গা পেয়ে শুয়ে পড়লাম। ঘুমালাম। শান্তির ঘুম।

২.

আমেনা বেগমের গোসলের কাজ শেষ হয়েছে। এক দিনের বাচ্চাকে গোসল করাতে বেশি সময় লাগে না। জানাজা পড়ানো হয়েছে। আরও একটি মৃতদেহ ছিল। মেয়ের মৃতদেহ। এক সাথে জানাজা হয়েছে। ছেলে হলে অবশ্য মেয়ের সাথে একই সাথে জানাজা পড়ানোর নিয়ম নেই। দুলাভাই আমাকে জড়িয়ে ধরে কাঁদলেন। আমার চোখে পানি নেই। আমেনা বেগমের জন্য কষ্ট হচ্ছে না। বরং তাকে ধন্যবাদ আমাকে নতুন একটি গল্পের প্লট দেওয়ার জন্য। আমি সবকিছু মনোযোগ দিয়ে খেয়াল করছি। ভালো গল্প লেখার জন্য প্রতিটি বিষয়ের খেয়াল রাখা দরকার। খেয়াল রাখছি।

টানা তিন দিন ঘুমাইনি কথাটা আসলে সত্যি নয়। গতকাল রাতে এক ঘণ্টার মতন সময় ঘুমিয়ে ছিলাম হাসপাতালে। দুলাভাইয়ের চিৎকারে ঘুম ভাঙে। জানা যায়, বেঁচে থাকার জন্য পঁয়তাল্লিশ মিনিট লড়াই করে মারা গিয়েছে মেয়েটা। এতটুকুন একটা শরীর কাফনের কাপড়ে মোড়া। মা বেহুঁশ ছিল। আমার খালা, চাচা, মামা সবাই কাঁদছিল। তাদের মন খারাপ ছিল। এক ঘণ্টা ঘুমিয়ে আমার ক্লান্তি কিছুটা কমেছিল।

সকালে নিয়ে এসেছি আমাকে বেগমকে কবর দিকে। গাড়িতে পুরো সময় আমার কোলে ছিল সে। কাফনের কাপড়ে মোড়ানো শরীরটা একদম হালকা। মরে গেলে কি মানুষ ওজনহীন হয়ে যায়?

আজিমপুর কবরস্থানে কবর দেবার আগে মৃত মানুষদের কিছু তথ্য লিখে রাখা হয়। একদিনের বাচ্চাকে নিয়ে কিছু লেখার নেই। দেখলাম দুলাভাই শুধু লিখেছে আমেনা বেগম, বয়স একদিন। আমি লেখক মানুষ। তবুও ভেবে পাচ্ছিলাম না আর কি লেখা যায়।

'কবরে নামেন। নামেন। বৃষ্টি আইবো আবার। তাড়াতাড়ি।' বলল কবর খোঁড়ার কাজ করা লোকটা।

আমি আমার গল্প নিয়ে ভাবছিলাম। এসব ভালো লাগছিল না। জানাজা শেষে আবার আমার কোলে দেওয়া হয়েছে আমেনা বেগমকে। আমি তাকে নিয়ে কবরে নামলাম। জানি না কি হল আমার। শীত লাগছে। ভয় হচ্ছে। এক দিনের বাচ্চার জীবনে কোন পাপ নেই। তার কবর যে ভূমিতে তা যে সে কবর নয়। এ কবর স্বর্ণভূমি। এ কবর পুণ্যের সোনায় মোড়ানো।

কবর দেওয়া হল। কবরে মাটি দিলাম। কেন জানি না শীতে কাঁপছি আমি। মার জ্ঞান ফিরেছে অনেক আগেই। মা, বাবা সমানে ফোন দিচ্ছে। কারো ফোন ধরছি না। প্রখ্যাত নাট্যকার একটা ম্যাসেজ পাঠিয়েছে। দেখলাম তাতে লেখা, সন্ধ্যের মধ্যে চার পর্ব লিখে পাঠাতে হবে। ক্লান্ত শরীরটা নিয়ে আমার কষ্ট হচ্ছিল খুব। করুণাময় কেন মানুষকে লেখক হিসেবে পাঠায়? লেখক হবার যন্ত্রণা বড়। গিয়েই লিখতে বসতে হবে।

শরীরে আমার আমেনা বেগমের ঘ্রাণ। যায়নি। কোনোদিন এ ঘ্রাণ কি মুছে যাবে? দুধে আলতা গায়ের রঙ মেয়েটার। আদর ও করতে পারলাম না। বুকের ভেতর ছোট্ট বাচ্চাটাকে নিয়ে বসে থাকতে পারলাম না কিছুক্ষণ। এই প্রথম আমার কান্না পেল। আমি তার মামা। আমার কাঁদা দরকার। কিন্তু কাঁদতে পারছি না। বাড়ি ফিরে লিখতে হবে। সহকারী চিত্রনাট্যকার হিসেবে আমার নাম যাওয়াটা দরকার।

আমি গাড়িতে গিয়ে বসলাম। তুলে দিলাম গাড়ির জানালার কাচ। বৃষ্টি এসেছে। জোর বৃষ্টি। আমি কাচের জানালা দিয়ে বৃষ্টি দেখছি। আমার খুব কান্না পাচ্ছে। খুব, খুব, খুব কান্না। কিন্তু আমি কাঁদবো না। আমেনা বেগমের জন্য কাঁদবো না। আমার হয়ে আজ বৃষ্টি কাঁদুক। অসহায় এক লেখকের জন্য বৃষ্টি কাঁদুক। কাঁদুক।